রাগ-বিরাগ

শ্রীযুধাজিৎ

বুক ব্যাঙ্ক
৫, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

প্রথম প্রকাশ : দোল পূর্ণিমা : তের শ চৌষট্টি

পাঁচ নম্বর শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট কলিকাতা বারো ঠিকানার 'বুক ব্যাঙ্ক'এর পক্ষ থেকে প্রকাশ করেছেন স্বত্বাধিকারিণী শ্রীমতী মাধুরী বক্সী। এক শ' সত্তর নম্বর রমেশ দত্ত ষ্ট্রীট, কলিকাতা ছয় ঠিকানায় অবস্থিত শ্রীভারতী প্রেস থেকে ছেপেছেন শ্রীপ্রমোদা চরণ কর। প্রচ্ছদপট এঁকেছেন তরুণ-শিল্পী সন্তোষ কুমার বসু।

॥ তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা

তাজমহল জগতে মাত্র একটিই নির্মীত হ'য়েছে, কিন্তু প্রেমিক শাজাহান ও প্রেয়সী মমতাজের মত মানুষ খুব বেশী না থাকলেও অনেক আছেন। তাদের কথাই এই কাহিনীতে বলতে চাওয়া হয়েছে—যারা চেয়ে পেয়েছে কিন্তু পেয়ে হারিয়েছে। পাঠক-পাঠিকা যদি এ বই পড়তে পড়তে শার্ঙ্গদেবের বিরহকাতর অন্তরের বেদনা ও স্বামীসোহাগ বঞ্চিতা বিষাদিতা মালবিকার হৃদয়ের ঈপ্সার সঙ্গে নিজেদের মনটিকে সমান্তরালভাবে উপস্থাপিত করতে পারেন, তবেই আমার এ কাহিনী লেখার শ্রম সার্থক হয়েছে ব'লে মনে করব।

দোল পূর্ণিমা
১৩৬৪

শ্রীযুধাজিৎ

প্রকাশিকার নিবেদন

শ্রীযুধাজিৎ নতুন লেখক। তাঁর লেখা প্রথম বই 'অনুরাধা' প্রকাশের সময় আমাদের মনে যে বিশেষ সংশয় ছিল তা বলাই বাহুল্য। কেননা আমাদের মত নতুন কোন প্রকাশকের পক্ষে নতুন কোন লেখককে প্রতিষ্ঠিত করার সঙ্কল্প নেওয়াটা দুঃসাহস ছাড়া কী? কিন্তু সুখের কথা এই যে সেই প্রথম পরীক্ষায় কি আমরা, কি শ্রীযুধাজিৎ উত্তীর্ণ হয়েছি ও হয়েছেন। তাঁর বই বাংলাদেশের পাঠক-পাঠিকা সাদরে গ্রহণ করে আমাদের অনুগৃহীত করেছেন। এই ভরসায়ই আমরা একই লেখকের দ্বিতীয় বইটিও প্রকাশের ব্যবস্থা করলাম। আমাদের আশা এই যে, যে পাঠকগোষ্ঠী শ্রীযুধাজিতের প্রথম বই পড়েই তাঁর ভক্ত হয়ে উঠেছেন, তাঁরা নিঃসন্দেহে 'রাগ-বিরাগ' পড়ে উপলব্ধি করতে পারবেন যে, বাংলা সাহিত্যের দরবারে ছদ্মনামধারী লেখক শ্রীযুধাজিতের আবির্ভাব হঠাৎ আলোর ঝলকানি নয়; পরন্তু তাঁর লেখনী সত্যই প্রতিষ্ঠার্জনের যোগ্য। প্রথম বই 'অনুরাধা' সম্পর্কে অনেকেই উপযাজক হ'য়ে অভিমত পাঠিয়েছেন। সেজন্য আমরা কৃতজ্ঞ। এ বইটির পাঠকবৃন্দও মতামত জানালে আমরা খুসী হবো। পাঠকদের উদ্দেশ্যে শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের কথায় ইতি টানি—

—প্রকাশিকা
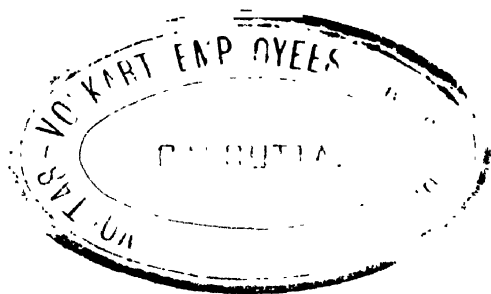
যদি জগতের কোন মেয়ে মনে করে যে তাকেই আমি
ভালবাসি—তারই হাতে তুলে দিলাম আজ
আমার রাগ-বিরাগ।

নিবেদন

এই উপন্যাসটি যখন সাংস্কৃতিক সাপ্তাহিক 'রূপাঞ্জলি' পত্রিকায় ছাপা হয়, যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি ও সঙ্গীত শিল্পীর নাম কাহিনীর বাস্তবতার প্রয়োজনে সন্নিবেশিত হয়েছিল তাঁদের উদ্দেশে নিবেদন করা ছিল যে, তাঁদের কারও নাম প্রকাশে আপত্তি থাকলে পুস্তকাকারে প্রকাশের সময় অসম্মতদের নাম সন্নিবেশে আমরা বিরত থাকব। কিন্তু সুখের কথা এই যে কারও কাছ থেকেই কোন অসম্মতিসূচক পত্র পাওয়া যায়নি। তাই বিশিষ্ট ব্যক্তি ও সঙ্গীতশিল্পীদের নাম যথাপূর্ব ছাপা হ'ল।

—লেখক

রাগ-বিরাগ

উপন্যাস

সারা ভারত সঙ্গীত সম্মেলন। উদ্বোধন দিবস আজ। দৈনিক ও সাময়িক পত্রিকায় পয়সা খরচ করে এ্যামুজমেণ্ট কলমের বিজ্ঞাপন ও উপরি ফাউ হিসাবে বিনা পয়সায় ফলাও করা রাইট আপ-এর দৌলতে সঙ্গীত-রস পিপাসু সহরবাসীর ভীড় হয়েছে বৈ কী।

তবে সে ভীড়ের অস্তিত্ব নির্দ্দিষ্ট প্রেক্ষাগারের বাইরে। পুলিশ-বেষ্টনীর বেশ কিছুটা দূরে। অচ্ছুতের মত তারা দূর থেকে যেন মন্দিরের দেবতা দর্শনের জন্য উঁকি-ঝুকি মারছে।

বড়জোর দু'একজন দুঃসাহসী তরুণ ঘাড়-ধাক্কার তোয়াক্কা না রেখে, প্রেক্ষাগারের কোলাপসিবল গেট পর্যন্ত এসে, তার বড়ো বড়ো খোপে চোখ-মুখ রেখে, হলের বারান্দায় বিচরণকারী বিচিত্র ও বহুমূল্য বেশবাসে বিভূষিত, বিশিষ্ট ভাগ্যবানদের দেখছে হাভাতে দৃষ্টিতে।

পুলিশ ব্যবস্থার বেশ কিছুটা বাড়াবাড়ি নজরে পড়বে তৃতীয়পক্ষ যে কারুরই। সাংবাদিক হিসাবে আমার চোখে ত পড়ল তা আগে-ভাগেই। তবে এমন পুলিশবাহুল্য আজকাল প্রায় বিচিত্রানুষ্ঠানেই চোখে পড়ে। তাই চোখ-সহা হয়ে গেছে আমাদের। এর পেছনে অবশ্য কারণ আছে। অতীতের প্রদেশ, স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর রূপান্তরিত রাজ্যের রাজ্যপাল স্বয়ং প্রায়ই আসেন নানা বিচিত্রানুষ্ঠানে উপস্থিত হতে। উপস্থিতির বিনিময়ে দক্ষিণা নেন বলে অভিনন্দন-যোগ্য মহৎ উদ্দেশ্য শুনেও অনেকেই আজকাল নাকি হাসেন! যাঁর জন্য পুলিশ বাহিনীর এত আয়োজন—যিনি রাজ্যের প্রথম নম্বরের মাননীয় নাগরিক—তিনি কাঁধে তুলে নিয়েছেন ভিক্ষার ঝুলি—তাঁরই স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করতে, যিনি সবকিছু-থাকা সত্বেও সবকিছুই দেশের ও দশের জন্য বিলিয়ে দিয়ে বেঁচে আছেন দেশবন্ধু হয়ে।

সরকারী পুলিশ কর্তব্যবোধে এই বিলাসী ভিক্ষুর জন্য সচেষ্ট হয়ে ছুটে আসে—তিনি যেখানেই যান না কেন। এখানেও তিনি এসেছেন আজকের অনুষ্ঠানের সভাপতি হিসাবে। তবে দক্ষিণা নিয়েছেন কিনা বলতে পারি না। আরও এসেছেন কেন্দ্রীয় বেতার ও তথ্যমন্ত্রী, এসেছেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী এবং ভারতের বৃহত্তম নগর কলকাতার পৌরপ্রধান। এতগুলি প্রথম শ্রেণীর নাগরিকের

একত্রিত উপস্থিতিতে যে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হচ্ছে, তার প্রতি সাধারণ জন-কৌতূহল উদগ্র হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

কিন্তু আর্থিক বিচারে যারা অসাধারণ নয় তাদের কৌতূহল চরিতার্থ হওয়ার মত সৌভাগ্য নেই। এক একটি আসন সংরক্ষণের নির্দিষ্ট অঙ্কের আয়তন এত স্ফীত যে ততদূর পকেটের পরিধি প্রসারিত করা সাধারণ-জনের সাধ্যে কুলোবে না কোনদিনই। তাই সমুপস্থিত যারা হলের ভিতরে ও করিডোরে ঘুরাঘুরি করছে বা হাসিঠাট্টা করে ফিরছে তাদের পায়ের পাতা থেকে মাথার চাঁদি পর্যন্ত সবটুকুই মোড়া আর্থিক-আভিজাত্যের আস্তরণে।

অনুষ্ঠান সুরু হল মঙ্গলাচরণ দ্বারা। তারপরই হ'ল সারা ভারতের সঙ্গীতপিপাসু মহলে 'ঠাকুর সাহেব' বলে পরিচিত পণ্ডিত ওঙ্কারনাথের উদাত্ত কণ্ঠের 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীত। রিসেপশন কমিটির চেয়ারম্যান স্বাগত সম্ভাষণ জানালেন। কর্তৃপক্ষস্থানীয় আরও দু'জন তাঁদের বক্তব্য পেশ করলেন নিয়মমাফিক। এরপর উদ্বোধন ভাষণ দিলেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রী—মার্গ সঙ্গীতের গুণগান করে। আর সভাপতির ভাষণ দিলেন রাজ্যপাল।

হলের বাইরে বিচরণকারিদের সঙ্গে ভেতরে যাঁরা ঢুকেছেন তাঁদের মধ্যেই শুধু ব্যবধান আবিষ্কার করে ক্ষান্ত হল না আমার কৌতূহলী দৃষ্টি। মঞ্চের উপর বসে সমুপস্থিত শ্রোতা-দর্শকের দিকে দৃষ্টি ছড়িয়ে দেখলাম যে বিশিষ্টদের জন্য আসনেরও বিশেষ ও অতি-বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে। সাম্যের গান গেয়ে যে যুগের মানুষ অসাম্য দূর করতে সদা সচেতন সে যুগেও সামান্য আসনের ফারাকের [illegible] দিয়ে উচ্চ-নীচ, ছোট-বড়র ব্যবধা বজায় রাখবার কি কৌতুককর প্রয়াস।

মঞ্চের মুখোমুখি সাজিয়ে রাখা এক সারি ফোকাস ও ফ্লাড লাইটের নিম্নাংশের উপর দিয়ে প্রাণবাণ ও নিষ্প্রাণ কুসুমসজ্জায় মঞ্চের শোভা বর্ধনের ব্যর্থ প্রয়াস করা হয়েছে। মঞ্চোপরি পশ্চাৎভাগের অংশকেও অভিনব সজ্জায় বিভূষিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু বলতে কুণ্ঠা নেই৷ যে সেই সাজসজ্জার সর্বাঙ্গ বিশ্লেষ করে আমার সৌন্দর্য্য-বুভুক্ষু সাংবাদিক মন এক কণা সৌন্দর্য্যও কুড়িয়ে পেল না। সৌন্দর্যের চেয়ে যেন ওতে বিজ্ঞাপনী ভাবটাই বড় বেশী প্রকাশ পেয়েছে।

উদ্বোধন পর্বের পর সরকারী আর বেসরকারী বিশিষ্টরা চলে গেলেন। তাঁরা চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই হলের বেশ কিছু আসন নিঃস্ব হয়ে গেলেও সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন স্নুরু হল পুণার অম্বাদাসজীর মৃদঙ্গ লহরীতে। এরপর গাইতে বসলেন শ্রীমতী মীণাক্ষী প্রেমি। মঞ্চোপরি ডান দিকের ব্ল্যাক বোর্ডে দৃষ্টি ফেলে দেখলাম, তিনি গাইছেন খেয়াল—গৌড়মল্লার রাগে। স্নুরে তিনি যতটুকু লাবণ্য ও মাদকতার স্পর্শ ছোঁয়াতে পারলেন তা মনে রাখবার মত সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁর কণ্ঠে আরও :শিল্পকারিতার প্রয়োজন যে রয়েছে তা ধরা পড়ল সমঝদারদের কানে। শ্রীমতী মীণাক্ষীর সঙ্গে তবলা সঙ্গত করেন বেনারসের পণ্ডিত শান্তাপ্রসাদ।

শ্রীমতী মীণাক্ষীর পরই আসরে বসলেন প্রখ্যাত গায়ক পণ্ডিত দত্তাত্রেয় বিষ্ণু পালুসকর। তিনি খেয়াল শোনালেন কেদারী রাগে। শ্রীপালুসকরের সাধনোচিত পরিশীলনে তাঁর কণ্ঠে অধিষ্ঠিতা হয়েছেন স্নুরলক্ষ্মী! তাই সহজেই তিনি শ্রোতাদের তৃপ্তি দিতে সক্ষম হলেন। 'মীরার পায়োজী রাম রতন ধন পায়ো' ভজনখানিতে অপূর্ব্ব স্নুর মূর্চ্ছনা দিয়ে তিনি সবার শ্রবণে সুধা বর্ষণ করেন।

সাংবাদিকের জীবন কর্ত্তব্যের ঘানিতে বাঁধা। তাই উপস্থিত অন্যান্য শ্রোতাদের মত আমি মৌজ করে সারারাত ধরে সঙ্গীত-রস পানে নিরত থাকতে পারলাম না। রোটারী মেসিনের আহ্বান তখন আমায় হাতছানি দিচ্ছে। সারাদিন ধরে আমি রূপ সাংবাদিক-যন্ত্রটি যা কিছু সংগ্রহ করেছি তার সবটুকু উজাড় করে দিতে হবে কাগজের বুকে। তারপর কালকের প্রভাতী কাগজ নিজ অঙ্গে সেই সংবাদের ছাপ নিয়ে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষের মনের জানবার ক্ষুধার নিবৃত্তি ঘটাবে। তাই ইচ্ছা না থাকলেও আমি উঠে পড়লাম, উঠে পড়তে বাধ্য হলাম। অবশ্য সম্মেলনের বাদবাকী রিপোর্ট নেবার জন্য পূর্ব ব্যবস্থা মত আমার স্থলাভিষিক্ত সাংবাদিক ততক্ষণে এসে গিয়েছিলেন। এছাড়া আমাদের ষ্টাফ ফটোগ্রাফার তো ফ্ল্যাশ বাল্‌ব সহ এদিকে ওদিকে ঘোরাঘুরি করছেনই। আজকের মত আমি সম্মেলন থেকে নিজের রসগ্রাহী আকাঙ্ক্ষাকে সরিয়ে নিয়ে ফিরে চললাম আমাদের দপ্তরের উদ্দেশ্যে।

দ্বিতীয় দিনের সান্ধ্য অধিবেশনে যথানির্দিষ্ট সময়েই এসে উপস্থিত হলাম। অনুষ্ঠান সুরু হল কুমারী বিজন ঘোষ দস্তিদার গ্রথিত মীরাবাই নৃত্যনাট্য দিয়ে। মীরার ভূমিকায় নৃত্যরূপারোপ করলেন শ্রীমতী মঞ্জুলিকা রায় চৌধুরী (ভাতুড়ী)। অনুষ্ঠান প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে বিজন দেবীর পরিচালনায় শ্রীমতী মীরা রায় চৌধুরী ও কুমারী ফুলুরাণী রায়ের কণ্ঠ নিশ্রিত মীরার ভজন-মালায়। বিমুগ্ধ দর্শক-শ্রোতা-সাধারণের মুহুর্মুহু করতালিতে প্রেক্ষাগার কল্লোলিত হয়ে ওঠে।

মীরাবাইর অনুষ্ঠান সমাপ্তির পর সঙ্গীতানুষ্ঠানোপযোগী মঞ্চ-সজ্জায় স্বেচ্ছাসেবকরা সচেষ্ট হয়ে ওঠে। মঞ্চোপরি একে একে পাশাপাশি পড়তে থাকে তক্তপোষ। তার ওপর বিছিয়ে দেওয়া হল সতরঞ্চি, তারও ওপরে পাতা হল চাদর। এরপর সাংবাদিকদের চেয়ারগুলি আসরের ডান দিকে সাজিয়ে দেওয়া হল শ্রেণীবদ্ধভাবে। যাতে সঙ্গীত শিল্পীদের শিল্পকারিতার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুরণনও সাংবাদিকদের শ্রবণ গ্রহণ করতে ব্যর্থ না হয়। একে একে সাংবাদিকরা ফোল্ডিং চেয়ারগুলির বুকে বসিয়ে দিলেন নিজেদের।

ক্ষণপরেই আসরে এলেন পুণার শ্রীমতী অঞ্জলিবাই লোলেলকার। ধবধবে দেহ তাঁর একটা সাদা-মাঠা বেনারসীতে আবরিত। নাসাগ্র ঈষৎ লালিমামণ্ডিত। ওষ্ঠদ্বয় মৃদু গোলাপী বর্ণের। শ্রীমতী লোলেলকার প্রথমে গাইলেন—কেদারী রাগে খেয়াল। তাঁর কণ্ঠের চূর্ণ স্বরবিবর্ত্তন বিশেষ শ্রবণসুখকর! খেয়ালের পর তিনি গাইলেন একটি ঠুংরী।

অঞ্জলিবাই বিদায় নিলে নিসার হোসেন খাঁ এলেন আসরে। বৈচিত্র্যধর্ম্মী ঘরোয়ানার খেয়াল গায়ক ওস্তাদ নিসারের কণ্ঠের সুরলহরীর বোল, তান, গমক ও সরগমের সাবলীলতা সচরাচর বড় একটা কোন কণ্ঠে শোনা যায় না।

এরপর আসরে এলেন বেনারসের বলবন্ত ঠাকুরের যোগ্য শিষ্য পণ্ডিত কামতা প্রসাদ। শ্রীপ্রসাদ আমেজী সুরে ছায়ানট রাগে খেয়াল সুরু করলেন। খেয়াল গাইবার সময় শিল্পী তাঁর কণ্ঠের স্বরবৈচিত্র্যের দিকে এতটা নিবিষ্ট থাকেন যে নিজের ভাবভঙ্গির প্রতি তাঁর আর খেয়াল থাকে না। সাংবাদিকদের আসন একেবারে আসরের অদূরে থাকায় ওস্তাদ গাইয়েদের সুর শ্রবণে পশাবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের ভাববৈচিত্র্যও নজরবন্দী করে নিচ্ছিলাম।

কিন্তু হঠাৎ একসময় আমার দৃষ্টি কামতা প্রসাদের উপর থেকে পিছলে পড়ল গিয়ে তাঁর পেছনে বসে তানপুরার তারে আঙ্গুল বুলিয়ে যেতে ব্যস্ত লোকটির উপর। সাংবাদিকদের দৃষ্টি-বৈচিত্র্যই ঐখানে—যখন যেদিকে তাকাবে তাতে ডুবে যাবে। আমিও এ স্বভাবের বাইরে নই।

দেখলাম তানপুরা বাদননিরত লোকটির 'আকর্ণ দিঘল বিলোচন' দুটি দৃষ্টিহীন। চোখের তারা থেকে সবটুকুই কেমন যেন একরূপ ঘোলাটে পর্দায় আচ্ছাদিত। লোকটি বেশ দীর্ঘ দেহী। সারা মুখের সবটুকু শ্রীই নষ্ট হয়ে গেছে তার ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কয়েকটি ক্ষত-চিহ্নে। মাথায় কুঞ্চিত কেশদাম। গায়ে ইষৎ সবুজে রঙের সার্জ্জের পাঞ্জাবী ও ফিকে নীল রঙের শাল। একান্ত তন্ময়তায় তিনি তানপুরার তানে মগ্ন। মাঝে মাঝে ওস্তাদ সুলভ ভঙ্গিমায় অনুচ্চ স্বরেই সুর-ভাঁজার ভঙ্গি করছেন। সত্যি কথা বলতে কি, আমার

মনে কেন যেহঠাৎতাঁর সম্বন্ধে একটা দুরন্ত কৌতূহলের জিজ্ঞাসা ফণা তুলে উঠল, তা আমিও তখন ভেবে পেলাম না মনোবিশ্লেষণ করে।

কামতা প্রসাদের খেয়ালের তালে তালে অন্ধ তানপুরাবাদকের মুখে কখনও দেখা যাচ্ছিল খুসীর রেশ, আবার কখনও কি গভীর এক নৈরাশ্যের ছায়া। আমার অনুসন্ধিৎসু মন বলল যে, গানের শিল্পকারীতায় লোকটি তুষ্ট হতে পারছিল না বলেই তাঁর মুখ-ভাবে অমন বৈচিত্র্যের সাক্ষ্য পাওয়া যাচ্ছিল। কিন্তু পরক্ষণেই আমার মনে হল যে, কামতা প্রসাদের যে সঙ্গীত শুনে সারা হলের শ্রোতারা বিমোহিত, তা ঐ অন্ধ সামান্য তানপুরাবাদকের মনস্তুষ্টি না করবার কি কারণ থাকতে পারে? আমার এ প্রশ্নের উত্তর তখন পাই নি বটে, কিন্তু পরে পেয়েছিলাম।

কামতা প্রসাদ ছায়ানট রাগের খেয়াল শেষ করতেই শ্রোতারা প্রবল করতালি মারফৎ তাঁর কাছে আরও একটি গানের জন্য দাবী জানালো। এবার সুরু হল তাঁর ধ্রুপদ—ইমন-কল্যাণ রাগে।

তাঁর গান শেষ হতেই তিনি নমস্কার করে উঠে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে দু'তিন জন সতীর্থ সাংবাদিক এগিয়ে গেলেন তাঁর সঙ্গে উইংস-এর আড়াল পর্য্যন্ত—তাঁকে অভিনন্দন জানাতে। আমি কিন্তু তাঁদের অনুসৃত পথে এগোলাম না। আমার সারা মন জুড়ে তখন বিরাজ করছে ঐ অন্ধ যন্ত্রীকে জানবার কৌতূহল। আমি এগিয়ে যেয়ে তাঁর হাত ধরে আসর থেকে মঞ্চের পাটাতনে নামিয়ে এনে বললাম:

—আইয়ে ওস্তাদজী।

লোকটির সারা অঙ্গ কেঁপে উঠল; বুঝিবা মনও। আমি অবাক হলাম। কিন্তু সে মুহূর্ত্তের জন্য। তিনি বললেন:

—আপ পয়ছানে ভুল কিয়া হ্যায় বাবুজী। ম্যয় হু ত এক মামুলি……

—আরে ও বাত ছোড়িয়ে না।

বলতে বলতে মঞ্চের পেছনের দিকে একটি অনধিকৃত চেয়ারের কোলে তাঁকে বসিয়ে দিলাম। পাশের খালি চেয়ারটাতে নিজেও বসলাম। লোকটি তাঁর অন্ধ হাতের নিশানায় হাতড়ে আমার অস্তিত্ব আবিষ্কার করে বললেন :

—বাবুজী আপকা কেয়া নাম হৈ ?

—মেরা নাম শেখরচন্দ্র বসু হৈ।

আমার নাম ত বললামই সেই সঙ্গে আমি যে একেবারে হেলা-ফেলা কেউ নই তা জানিয়ে তাঁর মনে প্রভাব ফেলবার আশায় পেশাটাও বললাম।

—ওঃ, আপ জার্ণালিষ্ট ? ইয়ে ত' বহুত আচ্ছা কাম হ্যায় বাবুজী। সবকো ভালাই কা লিয়ে হ্যায় এ কাম। হাম বহুত খুস হুয়া হায় বাবুজী, ইয়ে কি আপকা সাথ জান পয়ছান হুয়া হায়।

লোকটি হাসি মুখে অনুচ্চস্বরে বলে চলেন।

ইতিমধ্যে মাইকে শ্রীশচীন দাস মতিলাল গান গাইছেন বলে ঘোষিত হয়েছে। পরমুহূর্ত্তে পর্দাও সরে গেল। শচীনবাবু ততক্ষণে আসন নিয়েছেন। সারেঙ্গী, তানপুরা ও তবলা চূর্ণ স্বরে ও চূর্ণ তালে ঘাট বেঁধে নিচ্ছে। আসরের উচ্চ তক্তপোষের ঠিক পেছনেই আমাদের চেয়ার দুটি ছিল বলে আমরা দু'জন শ্রোতাদের দৃষ্টির আড়ালে পড়ে গিয়েছিলাম। তাই আমাদের অনুচ্চস্বরের কথোপ-কথনে কোন অসুবিধা হচ্ছিল না।

কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকবার পর আমি ওঁকে জিজ্ঞেস করে বসলাম ঃ

—ওস্তাদজী, আপকা নাম ?

প্রশ্ন শুনে লোকটির মুখাবয়বে ভাবান্তর দেখা গেল। হঠাৎই তাঁর মুখের সে বিনয়ী মধুর ভাবটি হল অদৃশ্য। কোন একটা কুণ্ঠা এবং কিছু একটা গোপন করার দোটানায় পড়লে মুখে যে ভাব ফুটে ওঠে তাই দেখা গেল তাঁর মুখে। তবে সে মুহূর্ত্তের জন্য। পরক্ষণেই কৃত্রিম হাসিতে মুখভাবের সঙ্গে মনের ভাবও গোপনে প্রয়াসী হয়ে বললেন ঃ

—বাবুজী, আপ বাঙালী হৈ ? বাঙলা বোলনে সক্‌তা ?

—হাঁ হাঁ কিঁউ নেহি ? হাম বাঙালী হায়।

—হাম ভি বাঙলা বলতে পারি, আবৃত্তি করতে পারি।

তাঁর মুখের বিশুদ্ধ বাঙলা শুনে আমি অবাক মানলাম। তাঁর কথা শেষ হতেই বলি ঃ

—কি করে শিখলেন বাঙলা

—বাবুজী, আমি মনে করি প্রত্যেক ভারতবাসীরই বাঙলা শেখা উচিত। উচ্চমানের সাহিত্য বলতে যা বোঝায় তা ত বাঙলা ভাষায়ই হয়। তাছাড়া গুরুদেব······

কথার মাঝখানে থেমে যুক্তকর কপালে ঠেকালেন।

—গীতাঞ্জলির মাধ্যমে এটা প্রমাণ করে গেছেন। আর নোবেল প্রাইজ দিয়ে বিশ্ববাসী যে সৃষ্টির উচ্চমান স্বীকার করেছে—সে সৃষ্টির উৎস যে ভাষা তার সঙ্গে যে কোন শিক্ষিত ভারতবাসীর পরিচয় না থাকাটা পাপ বলেই আমি মনে করি, বাবুজী।

আমি অবাক হয়ে শুনছিলাম তাঁর কথা। কতটা শ্রদ্ধা ও সুরুচির অধিকারী হলে এমন কথা বলা চলে! অন্যান্য প্রদেশবাসী

ত দূরের কথা, ক'জন বাঙালীর মনে এ ভাষার জন্য এতখানি দরদ, এতখানি শ্রদ্ধা আছে? একটা বিষয় আমি বেশ বুঝলাম যে, লোকটি তাঁর পরিচয় দিতে চাচ্ছে না! তাই অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করে আমায় বিভ্রান্ত করতে চাইছেন। এরপর পুনরায় তাঁর পরিচয় জিজ্ঞেস করাটাও ভদ্রতা বিরোধী। তাই আমি একটু ভাবনায় পড়লাম। ভাবনা অবশ্য আমায় কখনও ভুল পথে নিয়ে যায় না। আমি ওঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে, আবার দেখা হবে বলে জানিয়ে ষ্টেজের বাঁ দিকের উইংস দিয়ে ভেতরে চলে গেলাম।

ভেতরে তখন কামতা প্রসাদকে ঘিরে একদল সঙ্গীতোৎসাহীর মিশ্র কৌতূহলের প্রশ্ন চলেছে। আমি দৃশ্যে হাজির হতেই উদ্যোক্তাদের একজন আমার সঙ্গে ওঁর পরিচয় করিয়ে দিলেন। উভয়ে নমস্কার বিনিময় করলাম। তারপর আমি বললাম।

—আপ ত কামাল কর দিয়া ওস্তাদজী!

—হেঁ হেঁ বাবুজী, ও আপকা হি মেহেরবাণী।

এরপর আর বেশী দূর অগ্রসর হলাম না ভূমিকা নিয়ে। জানালাম যে তাঁর সঙ্গে আমার কিছুটা 'ঘরেলু বাতচিত' আছে। শুনে তিনি আসন ছেড়ে আমাকে অনুসরণ করে একটু একান্তে এলেন। আমি প্রশ্নের আকারে জানতে চাইলাম সেই অন্ধ তানপুরাবাদকের প্রকৃত পরিচয়। শুনে ওস্তাদজী আপ্যায়িতের হাসি হেসেও কুণ্ঠিতস্বরে বললেন:

—লেকিন, ইয়ে বহুত মুস্কিল কী বাত হায় বাবুজী।

—ও ক্যায়সে?

—কিউঁ কি হম উনকা পাস ওয়াদা কিয়া হায়, উনকো নাম আউর পাতা কোইকো নেহিঁ বোলেঙ্গে।

শুনে আমার মনের কৌতূহল আরও বহু গুণ বেড়ে গেল। কণ্ঠে অনুনয়ের শেষ স্বর ছুঁইয়ে ওঁর হাত দুটি নিজের হাতে নিয়ে বললাম যে, আমিও ওঁর পরিচয় ও নাম অপর কাউকে বলব না।

—মুঝে ক্ষমা কিজিয়ে বাবুজা। এ্যায়সি কাম মুঝসে নেহি হোগি। লেকিন···

—বোলিয়ে ওস্তাদজি ?

—উনকো নাম হাম নেহি বোলনে সাকেগে, লেকিন উনকো পরিচয় হাম দেতা হায় বাবুজী।

বলতে সুরু করে একবার থামলেন কামতা প্রসাদ। তারপর আবার বলতে লাগলেন ঃ

—ও হায় বেনারস হিন্দু ইউনিভারসিটি কো এক গ্রেট স্কলার।

তারপর কামতা প্রসাদ কথাপ্রসঙ্গে জানালেন যে, ঐ অন্ধ লোকটি তাঁর শিক্ষার্থীজীবনে যে যে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছেন, বরাবর প্রথম স্থান অধিকার করে উত্তীর্ণ হয়েছেন। শুধু যে লেখা-পড়ায়ই ভাল ছিলেন তাই নয়, সঙ্গীতের সাধনায়ও প্রকৃতই এক সফল শিল্পী ছিলেন। এ ব্যাপারেও ভগবানের অঢেল আশীর্ব্বাদ ছিল ওঁর মাথায়। এমন সৌভাগ্য সংসারের খুব কম লোকেরই থাকে। কিন্তু গত তিন বছর হল সবকিছু ছেড়ে দিয়ে উদ্-ভ্রান্তের মত জীবন কাটাচ্ছেন। অবশ্য এক গভীর আঘাত পেয়েই উনি এমনভাবে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন সংসারের সব প্রয়োজন থেকে। উনি কি ছিলেন, আর আজ কি হয়েছেন ভাবলে চোখের জল বাধা মানে না।

শেষের দিকে কামতা প্রসাদের কণ্ঠস্বর সত্যিই ভারি হয়ে আসে। চোখের কোণে দু' ফোঁটা জল ছল ছল করে। আমি বেশ বুঝতে

পারলাম যে, তাঁর মুখ দিয়ে তিনি যতটুকু প্রকাশ করেছেন বাস্তবে যে কাহিনী জড়িত আছে তা আরও বহুগুণ সংবেদনশীল, আরও বহুগুণ হৃদয়দ্রাবী। তাই সেই কাহিনীর স্মৃতিই কামতা-প্রসাদের চোখের কোণ বেয়ে ঝরিয়ে দিল ব্যথার অশ্রু; সমবেদনার প্রস্রবণ।

আমি তাঁকে শুক্রিয়া জানিয়ে কথাপ্রসঙ্গে জেনে নিলাম, তাঁরা আবার কবে অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আসছেন এবং কবে কলকাতা ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। তারপর 'নমস্তে ওস্তাদজী' বলে বিদায় নিলাম তাঁর কাছ থেকে।

চলে যাবার আগে আমার আবিষ্কৃত অন্ধ ওস্তাদের কাছ থেকেও বিদায় নিলাম। আর জানিয়ে গেলাম যে আবার দেখা হবে। তিনি আমার দু'হাত হাতে নিয়ে প্রীতি ভরে আমায় বিদায় দিলেন। আসরের গাইয়ে শচীন দাস মতিলাল তখন 'বলো রাতি কাঁহা থা' ঠুংরীতে শ্রোতাদের মাতিয়ে তুলেছেন।

পরদিন রবিবার। দ্বিপ্রাহরিক তৃতীয় অধিবেশনে যদিও অংশ গ্রহণের কথা ছিল পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুর, শ্রীমতী অঞ্জলিবাই লোলেলকার, ওস্তাদ আলি আকবর খান প্রমুখ শিল্পীদের—কিন্তু আমার ডিউটি অন্যত্র পড়েছিল বলে যোগদান করা সম্ভব হয়নি। আমার স্থলাভিষিক্ত সাংবাদিক সতীর্থর কাছে শুনেছিলাম যে পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঐ অধিবেশনে খেয়াল ও ভজন গেয়ে অনুষ্ঠানটিকে স্মরণীয় করে তোলেন। এ ছাড়া ক'লকাতার আসরে 'ঠাকুর সাহেব' এই বারই সর্ব্বপ্রথম দ্বিপ্রাহরিক অধিবেশনে গাইলেন। তিনি কোমল আশাবরী রাগে খেয়াল গাইতে এমন উচ্চমানের কণ্ঠ-পরিশীলন পদর্শন করেন যা শ্রোতাদের মনে বহুদিন ধরে অনুরণিত হবে। খেয়ালের পর তাঁর গাওয়া 'কনহইয়া ঝিঁঝরিয়া নৈয়া গহরি নদীয়া' ভজনখানিও অপূর্ব্ব হয়।

আজ আমার ডিউটি পড়েছিল শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের সাধন-সঙ্গিনী শ্রীশ্রীমা সারদা দেবীর শতবর্ষ জন্ম-জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত কয়েকটি মহতী শ্রদ্ধা-সভার বিবরণ লিপিবদ্ধ করার। অন্যান্য কয়েকটি অনুষ্ঠানের বিবরণ নিয়ে যথানির্দ্দিষ্ট সময়ে হাজির হলাম বেলুড় মঠে।

এখানে সারাদিন ধরেই নানাবিধ অনুষ্ঠান চলে। তার মধ্যে অতি প্রত্যুষে মঙ্গল আরতি, দেবীসূক্ত পাঠ ও উষাকীর্ত্তন, শ্রীশ্রী-মায়ের বিশেষ পূজা ও হোম, কালীকীর্ত্তন প্রভৃতিই প্রধান। এরপর বিকেলে সহস্র সহস্র ভক্তি-বিহ্বল নরনারীর স্বনিষ্ঠ ও সাগ্রহ উপ-স্থিতিতে বেলুড়ের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে বেলুড় মঠ ও মিশনের সভাপতি স্বামী শঙ্করানন্দের সভাপতিত্বে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতির ভাষণ

পাঠের পর শতবর্ষ জয়ন্তী উৎসবের সহকারী সম্পাদক স্বামী বিমুক্তানন্দ উৎসবের কার্য্য বিবরণী পেশ করেন। সভায় ডক্টর কালিদাস নাগ প্রমুখ বিশিষ্ঠ ব্যক্তিগণও ভাষণ দেন।

সভার কাজ শেষ হতে না হ'তেই ছুটলাম আমাদের পত্রিকার কার্য্যালয়ে। কেননা এ রিপোর্টটি খুবই জরুরী। কালকের প্রভাতী কাগজের প্রথম পৃষ্ঠার সংবাদ হয়ে শোভা পাবে। এ ছাড়া আরও একটি আশা ছিল আমার যে, তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করতে পারলে সঙ্গীত সম্মেলনে উপস্থিত হ'তে পারব আর শেষ আগ্রহ সহ চেষ্টা করতে পারব আমার আবিষ্কৃত অন্ধ ওস্তাদের আসল পরিচয় উদ্ঘাটন করতে।

কিন্তু মানুষের যে কোন বড় আশায় নানারূপ প্রতিবন্ধকতা আসেই। আমি কার্য্যালয়ে আসামাত্রই নিউজ এডিটর অনুরোধ করলেন যে আমিই যেন আজকের রিপোর্টটা হেডিং, সাব হেডিং সহ ডিসপ্লে করে দিই। এছাড়া যে ছবি তুলেছে ষ্টাফ ফটোগ্রাফার সেটাও সেট ক'রে দিতে হবে আমাকেই। তিনি নাকি কি কাজে যাচ্ছেন। রাত্রি এগারোটার আগে ফিরছেন না। তাঁর আদেশ আমায় মেনে নিতে হ'ল নীরবে। কেননা নিজের মনের আকাঙ্খাটা একান্ত ব্যক্তিগত, কিন্তু সংবাদটা সাজিয়ে ঠিক মত ফ্ল্যাশ করার প্রয়োজনের সঙ্গে লক্ষ লক্ষ পাঠকের সম্পর্ক রয়েছে।

যতই আমি অহরহ অন্ধ ওস্তাদের কথা মনে মনে আলোচনা করতে লাগলাম, ততই যেন তাঁর সম্পর্কে আমার কৌতূহল বহু হতে বহুতর হতে লাগল। পরদিন সারাদিনের মধ্যে স্মৃতিপটে বেশ কয়েকবার অন্ধ ওস্তাদের মুখ ভেসে উঠল। তাই বুঝলাম যে, তাঁর কাহিনী যতক্ষণ না আমার গোচরে আসছে, ততক্ষণ আমার

সাংবাদিকসত্তা আমায় নিস্তার দেবে না। সাধারণ লোকদের চেয়ে সাংবাদিকদের মনে কৌতূহলের মাত্রা কিছুটা বেশী থাকে বলেই দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর—নানা পরিবেশের নানা খবর সততার সঙ্গে সংগ্রহ করে সাগ্রহে প্রকাশ করতে তাঁরা সচেষ্ট থাকেন। সাংবাদিকদের মনের খবর সংগ্রহী কৌতূহল যেদিন হতোদ্দম হবে সেদিন জগতের সব সভ্যদেশের সবগুলি রোটারী মেসিনই অচল হয়ে যাবে। আর তার বিষময় পরিণতিতে খবর পড়ুয়া পাঠকদের কাছে পর প্রভাতটা কি নিঃসীম নিঃসঙ্গতাই না বয়ে আনবে—ভাবলেও শিউরে উঠতে হয়।

পরদিন সন্ধ্যা সাতটার আগেই আমি এসে হাজির হলাম পঞ্চম অধিবেশনে যোগদান করতে। যবনিকাটা তখনও শত শত শ্রোতার কৌতূহলী দৃষ্টি থেকে মঞ্চের মুখে ভেল টেনে রেখেছে। মঞ্চে যেয়েই আমার দৃষ্টি ঘুরে মরল একটি ক্ষতবিকৃত মুখ আবিস্কার করতে। কিন্তু ব্যর্থ হলাম।

আমি আমাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট আসনের একটিতে বসলাম।

অনুষ্ঠান সুরু হল বাচ্চা মেয়ে ব্রততীর ময়ুর নৃত্য দিয়ে। ফুটফুটে মেয়েটির স-মুদ্রা নৃত্যভঙ্গিমা দর্শকদের সপ্রশংস করতালি আদায় করল। আরও একটি মেয়ের নাচের পর মঞ্চের পাটাতন পরিস্কার করে দেয়া হল পাটের নাতা দিয়ে। তারপরই মঞ্চে আবির্ভূতা হলেন বোম্বের কুমারী দময়ন্তী যোশী—তার কথক নাচের ভঙ্গি নিয়ে। বেশ কিছুক্ষণ ধরে চলল তার স-বোল নৃত্য। কথক নাচের বোল নৃত্যের সুরুতে মাইক-এ মুখ নিয়ে বলাটা যদিও বা চলে—শেষের দিকে শিল্পীর অত্যধিক পরিশ্রমে মাইকে বোলের চেয়ে দীর্ঘমেয়াদি শ্বাসই বেশী শ্রুত হয়। নাচ শেষ হলে অন্যান্য দিনের মতই

আসর পাতা হল গানের জন্য। এ দিনের অনুষ্ঠানে বাংলার অন্যতম বিখ্যাত শিল্পী শ্রীতারাপদ চক্রবর্তী বাগেশ্রী রাগে খেয়াল গেয়ে তাঁর কণ্ঠের অপূর্ব্ব শিল্পকারিতার স্বাক্ষর দেন। তাঁর সঙ্গে তবলা সঙ্গত করেন প্রখ্যাত তবলিয়া ওস্তাদ কেরামতুল্লা।

এই অধিবেশনেই শ্রীবিষ্ণুদিগম্বর যোগ তাঁর ছাত্রী শিশিরকণাদের সঙ্গে প্রথমে মারু বেহাগ ও পরে রাগ-সাগর রাগে বেহালা বাজিয়ে শ্রোতাদের তন্ময়তার তুষ্টি বিধান করেন। শ্রীমতী সরদারবাই কারাগেকার ও শ্রীমতী নীহারকণা মুখোপাধ্যায় যথাক্রমে পটমঞ্জরী রাগ ও ইমন কল্যাণ রাগে খেয়াল শোনান।

অনুষ্ঠান সুরু হবার কিছুক্ষণ পরই আমার মনে পড়েছিল যে, আজ অন্ধ ওস্তাদের আসবার কথা ছিল না। কেননা কামতা প্রসাদের সঙ্গে তাঁকে যেতে হবে লালগোলা রাজ ভবনে এক ঘরোয়া আসরে। এ কথা মনে হতেই সারাদিন অধিবেশনে উপস্থিত থাকার যে আগ্রহ মনে ছিল তা যেন হঠাৎই নিভে গেল। তবুও বসে শুনতে হল অধিবেশনের সবটুকুই—কারণ কর্ত্তব্যের নিয়মে আমার ইচ্ছা বাঁধা।

পরদিন প্রথম গাড়ীতেই আমায় রওনা হতে হল শান্তিনিকেতন। আজ সেখানে অশীতিবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে সম্বর্দ্ধনা জানানো হবে শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীকে। সম্বর্দ্ধনা জানাবেন গীতবিতানের ছাত্রছাত্রী ও কর্ম্মীবৃন্দ।

আম্রকুঞ্জের ছায়া-সুনিবিড় আঙ্গিনায় গাম্ভীর্য্য পরিবেশে অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হল। মানপত্রের শ্রদ্ধার্ঘ বাণীতে বলা হল, "জীবনের শুভ সূচনায় কবি আপনাকে যে স্নেহাশীষ করিয়াছিলেন, দীর্ঘ আয়ুর প্রতি পদক্ষেপে তাহা সার্থক হইয়াছে আপনার জীবনে।

জীবন-গানের অবসানেও যাহার মধ্যে কবি বাঁচিতে চাহিয়াছিলেন তাহা কেবল আপনার ব্যক্তিজীবনকে অনুপ্রাণিত করে নাই, গানের সেই প্রাণবন্যা সর্বত্র প্রবাহিত করিয়া দিবার উদ্যোগেও আপনি আজিও অগ্রণী। যুগগুরুর দীন সেবক আমরা এই পুণ্যতিথিতে আপনাকে প্রণাম করি।"

শ্রীযুক্তা ইন্দ্রিরা দেবী চৌধুরাণীকে প্রথমে মালা চন্দনে ভূষিত করা হয়। বেদগানের দ্বারা অনুষ্ঠান সুরু হয়। গীতবিতানের সম্পাদক মানপত্রটি পাঠ করার পর উক্ত বিদ্যায়তনের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী রচিত "আয় বীণা আয়" গানটি গান। ইন্দিরা দেবী মানপত্রের উত্তরে নাতিদীর্ঘ ভাষণ দেন। বিশ্বভারতীর তদানীন্তন উপাচার্য শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেনও একটি মনোজ্ঞ কল্যাণ-ভাষণ দেন।

অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেলেও শান্তিনিকেতনের শান্ত পরিমণ্ডল থেকে সহজে বিদায় নিতে পারলাম না। কি এক অদৃশ্য আকর্ষণ যেন মনকে বশ করে রাখে, ইচ্ছাকে ডুবিয়ে রাখে 'আর একটু থাকি'র মোহরসে। তাই আমার কলকাতায় ফিরতে বেশ বিলম্বই হয়ে গেল। তাই সেদিন আর সঙ্গীত সম্মেলনে যাওয়া হল না।

সপ্তম অধিবেশন সুরু হল কুমারী বিজন ঘোষ দস্তিদার গ্রথিত ভক্তিমূলক নৃত্যনাট্য 'কবীর' দিয়ে। কবীরের ভজন ও দোঁহার অপূর্ব্ব লাবণ্যময় সুরারোপে অনুষ্ঠান চলাকালে সমস্ত হলের প্রেক্ষককুল বিমুগ্ধ হয়ে পড়েন। অনুষ্ঠান শেষ হতেই বিশিষ্ট দর্শকদের মধ্যে ডক্টর কালিদাস নাগ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে মঞ্চে যেয়ে কুমারী বিজন ঘোষ দস্তিদারকে নিয়ে এসে সপ্রশংসভাবে পরিচয় করিয়ে দেন মাননীয় রাজ্যপাল ডক্টর হরেন্দ্রকুমার মুখার্জ্জী মহাশয়ের সঙ্গে। তিনি আবেগাপ্লুত কণ্ঠে প্রশংসাবাণী উচ্চারণ করেন। পরে তাঁর লিখিত অভিমতদান প্রসঙ্গে জানান, 'I had the privilage of witnessing the performance of the devotional Dance Drama KABIR······a few days ago and was most highly impressed by it.'

'কবীর'-এর অনুষ্ঠান শেষ হলে বিরতি চলাকালে প্রেক্ষাগারের বারান্দায় পানায়ের দোকানটার কাছে পায়চারী করছিলাম, এমন সময় দেখলাম, কামতা প্রসাদ আসছেন তাঁর অপর দুজন সঙ্গী সহ। কিন্তু তাঁর সঙ্গে নেই আমার দৃষ্টিবাঞ্ছিত অন্ধ ওস্তাদ। কি একটা অমঙ্গলের সূত্র হঠাৎই আমার মন-দেহ যেন বেঁধে ফেলল। একরূপ ছুটে যেয়েই তাঁকে সনমস্কার বললাম :

—নমস্তে ওস্তাদজী।

—নমস্তে, নমস্তে।

—ওঁ কাঁহা ?

—উনকো ত' জেরা বুখার হুয়া বাবুজী।

—বুখার হুয়া ।

—হাঁ বাবুজী, আনেকা বখ্‌ত হামকো বোলা হায় কি—কামতা ভাই, হাম আজ নেহি যায়েঙ্গা, মেরা তবিয়ত আচ্ছা নেহি হায়।

—মেহেরবাণী করকে, আপকা পত্তা দেগা ?

—কিঁউ নেহি বাবুজী, ও হায় ছে নম্বর মঙ্গলদাস জাজরিয়া ইষ্ট্রীট।

—বহুত বহুত শুক্রিয়া।

—লেকিন ঘাবড়ানে কা কোই বাত নেহি বাবুজী, ও বুখার মামুলিই হায়।

কামতা প্রসাদ মঞ্চের দিকে চলে গেলেন। আমিও কালবিলম্ব না করে বেরিয়ে পড়লাম বড়বাজার অঞ্চলের জাজরিয়া ষ্ট্রীটের উদ্দেশ্যে।

চার নম্বর বাসে উঠে বারবারই মনে হতে লাগল যে কামতাপ্রসাদ না জানি অন্ধ লোক বলে তাঁর প্রতি কত অবহেলা করছে।

কিন্তু আমার এ ধারণা ধোপে টিকলো না। অন্ধ ওস্তাদের ঘরে ঢুকে তাঁর মাথায় হাত দিয়ে দেখলাম জ্বর নেই। তিনি বললেন যে মামুলি জ্বরই হয়েছে। বোধ হয় ঠাণ্ডা লেগে সর্দ্দি হবার দরুণ এমনটি হয়েছে। ইতিমধ্যেই দুটি ইনফ্লুয়েঞ্জা ট্যাবলেট খেয়ে নিয়েছেন। আর ভাবনা নেই।

তাঁর শরীর সম্বন্ধীয় আমার অনুসন্ধিৎসু প্রশ্নসমূহের উত্তর দেওয়া শেষ হতেই তিনি বললেন :

—আপনি যে কষ্ট করে এতদূর ছুটে এসেছেন সে জন্য অশেষ ধন্যবাদ।

—না না, তা কেন, হাজার হলেও এ সহরবাসী প্রত্যেকেরই

আপনি অতিথি। তাছাড়া, আর যে কোন দিকে আমাদের বদনাম থাক, বাঙালী অতিথিবৎসল জাতি।

—ও ত' ঠিক বাত বাবুজী।

হাসতে হাসতে বললেন অন্ধ ওস্তাদ।

—বাবুজী, একটু চা খাবেন?

—না ওস্তাদজী, আমি সারাদিনে মাত্র দু'কাপ চা খাই।

—পান? সিগ্রেট?

—মাপ করবেন, কোন নেশা আমি করিনা।

—এ খুব ভালো বাবুজী, সিগ্রেট খাওয়াটা যেন আজকাল ফ্যাসান হয়ে উঠেছে। গান্ধীজির বিলেতী বর্জ্জনের সময় তবু কিছুটা কমেছিল, আবার যে-কে সেই। আমাদের মত আত্মবিস্মৃত জাত যদি দ্বিতীয় থাকে, বাবুজী।

—খুব খাঁটী কথা বলেছেন।

এরপর কিছুক্ষণ নীরব থেকে আমি কুণ্ঠিত স্বরে বললাম :

—একটা কথা বলব, ওস্তাদজী?

—কি কথা, বলুন।

—আগে কথা দিন, সে কথা রাখবেন।

—দেখুন বাবুজী, যদি বিলাস বা আমোদ-প্রমোদ কিছু না হয়, নিশ্চয়ই রাখবো। ব্যক্তিগত কারণে আমি ওসব ছেড়ে দিয়েছি।

—বিলাস-ব্যসন কিছু নয়।

—তবে বলুন, বাবুজী।

সাগ্রহে বললেন তিনি।

—আগামী শনিবার আমার বাড়ীতে আপনার চায়ের নেমন্তন।

—এ ত' খুব খুস খবর বাবুজী। কেন যাবো না!

—নেমন্তন্ন আমি করলেও, আমি দূত মাত্র। আসলে এ নেমন্তন্ন এসেছে অন্দরমহল থেকে।

—আমার কথা বুঝি বলেছেন বৌদিকে ?

—না বলে উপায় আছে ? আমায় সারাদিনের প্রথম দফে রিপোর্ট দিতে হয় অফিসে, আর দ্বিতীয় দফে···

—একেবারে হেড অফিসে !

আমার কথার মাঝেই বলে সশব্দে হেসে উঠলেন অন্ধ ওস্তাদ তাঁর প্রাণ-খোলা হাসি ! আমিও সে হাসিতে যোগ দিলাম।

পরদিনই সম্মেলনের অধিবেশন ইতি টানবে। আজ অফিস আদালত বন্ধ বলে বেলা সাড়ে দশটায় বসবার কথা ছিল অষ্টম অধিবেশন এবং যথারীতি সন্ধ্যা সাতটায় নবম বা শেষ অধিবেশন।

সময়ের প্রতি সাংবাদিকদের সম্মান না দেখালে চলে না। তাই আমি ঠিক সওয়া দশটায়ই এসে পড়লাম অনুষ্ঠানক্ষেত্রে। কিন্তু হা হতোস্মি! তখন পর্য্যন্ত হলের মাঝে খুব বিরল সংখ্যক সঙ্গীতানুরাগীকেই উপস্থিত দেখলাম। তাই উদ্যোক্তাদের জনৈক ভদ্রলোককে কারণ জিজ্ঞেস করতে হল। তিনি জানালেন যে বেলা বারোটার আগে কোন মতেই আসর বসবে না। মনে মনে ভেবে দেখলাম যে বারোটার আসর জমতে জমতে একটা দেড়টার আগে হবে না। তাই এতটা সময় অপচয়ের কোঠায় ঠেলে দেওয়াটা বুদ্ধি অনুমোদিত পন্থা ভাবতে পারলাম না। সুতরাং আমাদের কার্য্যালয়ের দিকে ফিরে যাওয়া সাব্যস্ত করে এগিয়ে চললাম। কিন্তু এস্‌প্ল্যানেডের কাছাকাছি এসেই মনে পড়ল রজত জয়ন্তী দলের সঙ্গে ভারতের তৃতীয় টেষ্ট খেলার কথা। তাই ইডেন উদ্যানের আকর্ষণে সেই দিকেই এগিয়ে চললাম।

এ্যাক্রেডিটেড কার্ড দেখিয়ে প্রেসের জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানে এসে দেখলাম যে আমাদের পত্রিকার ক্রীড়া সম্পাদক ও অপর একজন প্রতিনিধি উপস্থিত রয়েছেন। প্রতিনিধি ভদ্রলোক আমি সম্মেলন ছেড়ে চলে এসেছি শুনেই লাফিয়ে উঠে বললেন :

—দাদা, আমায় দিন কার্ডটা।

আপত্তি ছিল না আমার। কেননা অষ্টম অধিবেশনের শিল্পী

তালিকায় আকর্ষণীয় নাম দু'একটির বেশী ছিল না। তবে আমার কার্ডটি হস্তান্তরিত করবার সময় বিশেষ করে বলে দিলাম যে, তিনি যেন অধিবেশন শেষ হলেও আমি না আসা অবধি সেখানে অপেক্ষা করেন। ভদ্রলোক মহা খুশি হয়ে চলে গেলেন।

খেলা বিশেষ জমল না। কোনরকমে সময়টা গড়িয়ে চলল মাত্র। সারাদিন ব্যাট ও বলে ঠোকাঠুকি করতে অক্লান্ত পরিশ্রম করা সত্বেও ভারত ৯ উইকেটে মাত্র ২২৫ রাণ সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। তৃতীয় টেষ্ট সম্পর্কে ভারতের উপর বিজয় লক্ষ্মীর নেক নজর পড়বে না—এমন একটা আঁচ করে হতাশ মন নিয়েই এগিয়ে চললাম সঙ্গীত সম্মেলনের উদ্দেশে।

হলে এসে দেখলাম, করিডোরে ইতস্তত ঘোরাঘুরি করছে বিভিন্ন ও বিচিত্র বেশভূষায় ভূষিত নরনারীরা। আমাদের প্রতিনিধি ভদ্রলোকও এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমি তাঁর কাছে এগিয়ে যেতেই জানালেন যে, এই মাত্র দ্বিপ্রাহরিক অধিবেশন শেষ হল। আরও জানালেন যে, ওস্তাদ নিসার হোসেন নাকি অপূর্ব্ব শিল্পদক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। অনেকের মুখেই আলোচিত হতে শুনলাম ঐ একই কথা। জনৈক স্বেচ্ছাসেবককে প্রশ্ন করে জানলাম যে, অধিবেশন স্থুরু হতে কিছু বিলম্ব হবে, কেননা এখন প্রেক্ষাগৃহ পরিষ্কার করা হচ্ছে ফ্লিট দিয়ে। স্থতরাং বেশ কিছুক্ষণ উদ্দেশ্যহীন ভাবে করিডোরে পায়চারী করে বেড়াতে লাগলাম। ফলে পরিচিত ক'জন ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলার নমস্কারের প্রত্যুত্তর দিতে অনেকবার যুক্ত কর কপালে তুলতে হলো।

অধিবেশন স্থুরু হল সমবেত নৃত্য দিয়ে। কয়েকটি নাচের অনুষ্ঠান শেষ হতে না হতেই রাত্রি সময়ের পায়ে পায়ে এগিয়ে চলল

নিশুতির দিকে। এরপর আসরে বসলেন শ্রীমতী অপর্ণা চক্রবর্ত্তী, গাইলেন খেয়াল—কামোদি রাগে।

অপর্ণা দেবীর পর আসরে এলেন ওস্তাদ আশাদ আলি খান। ইনি খেয়াল গাইলেন জয়জয়ন্তী রাগে। খেয়ালের পর গাইলেন একটি ধ্রুপদ।

ওস্তাদ আসাদ আলির পরই আসরে এলেন কামতা প্রসাদ। ইনি খেয়াল স্থুরু করেন তিলোক কামোদ রাগে। আমার অন্ধ ওস্তাদের হাতে আবার স্থুর-বিস্তার স্থুরু হল তানপুরার তানে। কামতা প্রসাদ সেদিনের চেয়েও সূক্ষ্ম রাগালাপের পরিচয় দেন। খেয়ালের পর কামতা প্রসাদ একটি ভজন গেয়েও তৃপ্ত করেন শ্রোতৃসাধারণকে।

কামতা প্রসাদের গানের পরই মাইকে ঘোষণা করা হয় যে, এরপর কথক নৃত্য প্রদর্শন করবেন কুমারী দময়ন্তী যোশী। আবার আসরের তক্তপোষ তোলা হয়। ঝেড়ে মুছে পরিষ্কার করা হয় মঞ্চের পাটাতন। কুমারী দময়ন্তী ও তার বৃদ্ধা মা একটি একটি করে কুটোকাটা পরিষ্কার করে নেন। সাংবাদিকদের চেয়ারগুলোও স্থান পরিবর্ত্তন করে। সারেঙ্গী, তবলা ও হারমোনিয়ামের স্থুরে আনা হয় সমতা। দময়ন্তী কান পেতে শোনে স্থুর। তারপর ইসারা করে পর্দা সরাতে—দর্শকদের দিকে সঞ্চরণশীল দৃষ্টি ফেলে এগিয়ে যায় মঞ্চের ডান দিকে রক্ষিত মাইকের দিকে। আরম্ভ করে কথকের বোল। হাতে তালি বাজে তালে তালে। বোল শেষ হতেই দুলে ওঠে তার সারা দেহ, বাহু, আঙ্গুল, চোখ ও পায়ের পাতা—পরস্পরের সঙ্গে সমতা রেখে। মুদ্রা থেকে মুদ্রান্তরে বিচরণ করে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।

রাত্রি দুটোয় শেষ হল দময়ন্তীর নাচ। তারপর আসরে এলেন কুমারী বিজন ঘোষ দস্তিদার তাঁর একক অনুষ্ঠানে খেয়াল শোনাতে। খেয়ালের সুরবিবর্ত্তনে তিনি বিমুগ্ধ দর্শকদের করতালি-স্নাতা হয়ে বিদায় নেন।

বিজন দেবীর পর আসরে এলেন লাবণ্যময়ী শরণরাণী—স্বরোদের সুর নিবেদনের জন্য। কিছুক্ষণের মধ্যেই বাজনা জমে ওঠে তাঁর। স্বরোদের তালে তালে আন্দোলিত হয় তাঁর মাথা—মাথার শাম্পু করা স্বর্ণ-কেশদাম। সুরের গভীরতায় পৌঁছাতে মাঝে মাঝে দংষ্ট্রাগ্র দিয়ে লাল ওষ্ঠরঞ্জনী রঞ্জিত রক্তিম অধর দংশন করেন। ক্ষণে ক্ষণে শ্রোতাদের অজস্র প্রশংসা পড়ে।

রাত্রি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সামনের দিকের বেশী দামের আসনের অনেকেরই চোখ শিবনেত্রের রূপ ধারণ করে! অনেকেই তখন ঘুমে ঢুলু ঢুলু আঁখি। তৃতীয় সারীতে বসা এক ধনী ব্যবসায়ীর পুত্র চেয়ারের ডান দিকে ঘুমিয়ে ঢলে পড়েছে—আর ডান দিকের আসনে বসা কোন এক আধুনিকা তরুণী ঘুমিয়ে ঢলে পড়েছে বাঁ দিকে। উভয়ের মুখে তখন উভয়ের উষ্ণ নিশ্বাস-পাত হচ্ছে, উভয়ের ওষ্ঠদ্বয়ের অবস্থান মাত্র এক-দেড় ইঞ্চির ব্যবধান। এদৃশ্য জাগরণ অনেক জোড়া কৌতূহলী দৃষ্টিতে কৌতুকের ছাপ ফেলেছে।

কোথাকার কোন্ রাজকুমার পার্শ্বে বসা তাঁর অর্দ্ধাঙ্গিনী যতবার ঘুমঘোরে ঢ'লে পড়তে যাচ্ছে কোন কোটালপুত্রের চেয়ারে—ততবার তাকে টেনে টেনে তুলছে—চারদিকের লোকের নজর বাঁচিয়ে।

তরল পানীয়ে প্রভাবিত কোন কোন শ্রোতা সঙ্গীতের সুরমূর্চ্ছনার তালে তালে দুলে দুলে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েছে। মুখে তাদের অনলস প্রশংসাবাণী! প্রায় বুজে আসা চোখ বারবার টেনে খুলে সচিৎকারে

বলে ওঠে—আঃ, কেয়া শুনায়া ওস্তাদ। কেউ আবার বলে—দিল খিঁচকে লিয়া ওস্তাদ! কেউ বলে ওঠে—ও হো-হো ওস্তাদ।

শরণরাণীর স্বরোদের ঝাপড় শুনে পঞ্চম সারিতে উপবিষ্ট নিদ্রিত এক নেশাসক্ত ব্যক্তি চমকে জেগে উঠেই বলে—ব্‌হা জননী। •••চ্ছা!···চ্ছা!

কোন কোন তরুণ-তরুণী নিদ্রামুক্ত হবার জন্য হলের পার্শ্ববর্তী কাফের পর্দা ঘেরা কামরায় গিয়ে বসে চায়ে চুমুক দিয়ে দেহ চাঙ্গা করতে। চায়ের শুষ্ক কঠিন কাপে চুমুক দিতে গিয়ে যদি একান্তে এ গভীর রাত্রির কোন গভীর ইঙ্গিতে সঙ্গিনীর নরম রক্তিম ওষ্ঠ চুম্বন করে বসে, তা কতটুকু দুষণীয় সে বিচারের ভার আমার নয়।

শরণরাণী স্বরোদ শেষ করে উঠে পড়বার পর প্রায় চারটেয় আসরে এলেন ঠাকুর সাহেব—ওঙ্কারনাথ। সারা হলের শ্রোতাদের মধ্যে অভূতপূর্ব্ব চাঞ্চল্য পড়ে গেল! সকলের সমবেত করতালি তাঁকে অভিনন্দন জানাল। হলের বাইরে এদিকে ওদিকে যে যেখানে ছিল—ওঙ্কারনাথের নাম ঘোষিত হতেই ব্যস্তসমস্তে ছুটে এলেন আসন দখল করতে।

ওঙ্কারনাথ আসরে বসে সুরদেবীর আরাধনা শেষ করে মৌজী ভাঙ্গতে খেয়াল ধরতে গিয়ে শিষ্য ও তানপুরা বাদককে বললেন—'ধর বেটা।' সুর উঠল তানপুরায়, বোল উঠল তবলায়, সারেঙ্গীওলা নড়ে চড়ে বসল। ঠাকুর সাহেব নিশির শেষ প্রহরে ললিতা রাগে খেয়াল ধরলেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই প্রেক্ষক-শ্রোতাদের চক্ষুরাজি থেকে নিদ্রা বিদায় নিল। রসিকজন ঠাকুর সাহেবের সঙ্গীত-রস পানে কল্পলোকে যেন স্পষ্ট দেখতে পেলেন ললিতা রাগের রূপ—'ললিতা

বাসক সজ্জায় সজ্জিতা, নানা আভরণে বিভূষিতা, মনোহর বসন, নাগিনী ,সদৃশ বদ্ধবেণী লম্বমানা। সে সৌন্দর্য্য ও লাবণ্যময়ী, কাঞ্চনবর্ণা, আয়ত ও চারুনেত্রা, ক্ষীণাংগী, ক্ষীণ কটিদেশ, সহচরীরা পুষ্প মাল্য রচনা করে দিল ললিতার হস্তে, তার নায়কের জন্য'।

আলাপের সুরবিবর্ত্তন সারেঙ্গী বাদক অদ্ভূত দক্ষতায় পুঙ্খানুপুঙ্খ-যন্ত্রে তুলে নিতে সক্ষম হচ্ছিল দেখে মুগ্ধ ঠাকুর সাহেব তাকে উৎসাহিত করলেন—'জিও, জিও 'বলে।

বিভিন্ন আলাপের সঙ্গে সুর তান লয়ে অপূর্ব্ব কণ্ঠকারিতার পরিচয় দিয়ে ঠাকুর সাহেব যখন থামলেন তখন শ্রোতৃকুল কয়েক মিনিট ধরে উচ্ছ্বসিত করতালি না চালিয়ে পারল না। সেই কর-তালির শব্দ ভেদ করে একাধিক নারী পুরুষের কণ্ঠে অনুরোধ এলো ঃ

—যোগী মৎ যাও! যোগী মৎ যাও!

—কাঁহে ঘাবড়তা হায়, যোগী ত' যাতা হায় নেহি, হিঁয়াই বৈঠ রতা হ্যায়।

কৌতুককণ্ঠে সহাস্য মুখে বললেন ঠাকুরসাহেব। তারপর কণ্ঠের সবটুকু দরদ দিয়ে ধরলেন—'যোগী মৎ যা, মৎ যা' ভজনটি। বিমুগ্ধ সুর-আবিষ্ট শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনতে লাগল সে স্বর্গীয় সঙ্গীত।

ঠাকুর সাহেবের ভজন শেষ হ'তে হ'তে পূর্ব্ব দিগন্তে সূর্য্য উদিত হয়েছিল। তার পরেও যে দু'একটা প্রোগ্রাম বাকী ছিল সে সব শোনার আর আগ্রহ ছিল না। তাই সঙ্গীত সম্মেলনের শেষ অধিবেশন শেষ না হতেই আমি এবং আমার সতীর্থ সাংবাদিকদের কয়েকজন এবং শ্রোতাদেরও অনেকে বিদায় নিলাম।

শনিবার সকাল থেকেই আমাদের স্বামী-স্ত্রীর ছোট্ট সংসারে উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে প্রস্তুতির সাড়া পড়ে গেল। আজ বিকেলে অন্ধ ওস্তাদকে চায়ের নেমন্তন করেছি। তবে চা উপলক্ষ্য মাত্র বরং টায়ের আয়োজনের ব্যাপারেই আমরা উভয়ে বিশেষভাবে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। সকাল থেকে দু'জনে মিলে তিন চার বার ফর্দ করলাম, আবার ছিঁড়লাম, ছিঁড়ালাম আবার করলাম। শেষ পর্যান্ত আমার অর্দ্ধাঙ্গিনীর প্রস্তাবেই আমি পূর্ণ সমর্থন জানাল'ম। তিনি বললেন যে, যিনি বাংলা ভাষা ও জাতীয় কৃষ্টির প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাশীল এবং যিনি জাতীয়তা সম্পর্কে সচেতন তাঁকে বিদেশী খাবারের আয়োজনে আপ্যায়িত না করে দিশী খাবারে আপ্যায়িত করাই যুক্তিযুক্ত। একথা বিবেচনা করে শেষ পর্য্যন্ত নানা রকম পিঠে-পায়েসের আয়োজন করার সিদ্ধান্ত উভয়ের সমবেত সম্মতিতে গৃহীত হ'ল। তাই আমি কালবিলম্ব না করে মঞ্জুলার ফর্দ নিয়ে বাজারে বেরিয়ে পড়লাম।

মঞ্জুলা সারাদিন ধরে পরম উৎসাহে পিঠে পায়েস ও আনুসঙ্গিক যা কিছু প্রস্তুত সমাপ্ত করলেন। বেলা অস্তাচলের পথে অনেকখানি এগিয়ে গেল আমরা উভয়ের মিলিত চেষ্টায় ঘরদোর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ক'রে, দরজা জানালার পর্দা পালটিয়ে, টেবিলের উপরের ফ্লাওয়ার ভাসটায় শ্বেতশুভ্র রজনীগন্ধার গুচ্ছ সাজিয়ে ও ধূপদানীতে ধূপকাঠি গুঁজে রাখতে রাখতে।

সাজান গুছান যতদূর সম্ভব হয়ে গেলে আমি বৈকালিক গা-ধোয়া শেষ ক'রে বেরিয়ে পড়লাম জাজরিয়া ষ্ট্রীটের উদ্দেশ্যে।

অন্ধ ওস্তাদের বাসায় এসে দেখলাম, তিনি পোষাক-আশাক পরে একেবারে প্রস্তুত হয়ে আমার আগমনের প্রতীক্ষা করছেন। গায়ে তাঁর সেই ফিকে সবুজ সার্জের পাঞ্জাবী আর ফিকে নীল শাল। আমরা আর কালক্ষেপ না ক'রে বেরিয়ে পড়লাম।

সায়ংকাল তখন প্রায় উত্তীর্ণ। এমন সময় আমাদের ট্যাক্সি এসে থামল আমার বাড়ীর সামনে। মিটারে ওঠা ভাড়া চুকিয়ে ওস্তাদের হাত ধরে তাঁকে নামিয়ে নিলাম যান থেকে। অন্দর মহলে পা দিয়েই তিনি বলে উঠলেন :

—কৈ, ভাবীজী কোথা ?

—আপনার সম্মুখেই দণ্ডায়মানা।

বললাম আমি। মঞ্জুলা 'আসুন' বলে অভ্যর্থনা জানালেন। অন্ধ ওস্তাদ যুক্ত কর কপালে ঠেকিয়ে বললেন :

—নমস্তে ভাবীজী।

—নমস্কার।

বললেন মঞ্জুলা।

আমি তাঁকে একটা চেয়ারের কাছে নিয়ে গেলে তাতে উপবেশন করতে করতে অন্ধ ওস্তাদ বললেন :

—আপনাদের মত বিশিষ্ট দম্পতী যে আমার মত এক হত-ভাগাকে এমন আন্তরিক আপ্যায়ণ করছেন, এ জন্য আমার কৃতজ্ঞতার সীমা নেই।

—সে কি ! ও কথা বলছেন কেন।

বললেন মঞ্জুলা :

—আমরা আপনাকে বন্ধু মনে করেই আমন্ত্রণ জানিয়েছি।

তাছাড়া আপনার মত গুণীজন যে আমাদের কুটীরে পদধূলি দিয়েছেন, সে জন্য আমরা নিজেদের ভাগ্যবান মনে করছি।

—গুণী!

কথাটা বলে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ওস্তাদ।

—হ্যাঁ একদিন হয়ত এ হতভাগ্য গুণী হিসাবে আসন দাবী করতে পারত। কিন্তু আজ 'কোন গুণ নাই তার কপালে আগুন'। হ্যাঁ বৌদি, বিধি-লিপির আগুন আমার জীবনের সব সুকৃতিকে জ্বলিয়ে পুড়িয়ে ছাই ক'রে দিয়েছে।

শেষের দিকে ওস্তাদের স্বর ব্যথা-ভারি হয়ে আসে।

—যা বলতে আপনি ব্যথা পান, তা নাই বা বললেন।

মঞ্জুলা বলেন।

অন্ধ ওস্তাদ আর কোন কথা বলেন না। মাটির দিকে মুখ করে হঠাৎই কেমন যেন আত্মস্থ হয়ে যান।

আমি মঞ্জুলাকে আহার্য্য আনতে ইঙ্গিত করলাম। তিনি অন্দরের পথে অদৃশ্য হ'য়ে গেলেন।

একটু পরে ফিরে এসে এক একটি পদের পরিচয় দিয়ে দিয়ে মঞ্জুলা আহার্য্য পরিবেশন করলেন। আমি বললাম:

—সবই বাঙ্গালী খানা, হয়তো আপনার খুব অসুবিধা হবে।

—অসুবিধা? না না, অসুবিধা হবে কেন, বাঙ্গালী খাবার মালবিকা আমায় কতদিন নিজে হাতে তৈরী করে খাইয়েছে।

বলামাত্রই ওস্তাদের মুখে চোখে পরিবর্তন দেখা গেল।

মনে মনে ভাবলাম 'মালবিকা! কে সে?' আমি মঞ্জুলার চোখে তাকালাম একবার। তারপর বললাম:

—আচ্ছা ওস্তাদজী, মালবিকা কে, তিনি কী বাঙ্গালী ?

—বাবুজী, আমার সম্পর্কে আপনার খুব কৌতূহল, নয় ?

—আপনার অনুমান অভ্রান্ত ওস্তাদজী। যেদিন আপনাকে প্রথম দেখলাম, যেদিন প্রথম আলাপ হ'ল আপনার সঙ্গে, সেদিন থেকেই আমার মনে এ ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে, আপনি সামান্য তানপুরাবাদকই নন, সুরলক্ষ্মীর অনেক আশীর্ব্বাদই বর্ষিত হয়েছে আপনার মাথায়। কিন্তু আমার মনে এই প্রশ্ন অহরহ কাঁটার মত বিঁধছে যে, কেন আপনি সব ছেড়ে দিলেন, কি সে কারণ, যে জন্য রাগসঙ্গীতের প্রতি আপনার এই বিরাগ। কি এমন কারণ ঘটল, যে জন্য সারা জীবনের সাধনায় অধীত বিদ্যার প্রতি আপনার এমন বৈরাগ্য ?

—বাবুজি ! থামুন, আর বলতে হবে না। বুঝেছি আপনি কি জানতে চান। আপনারা সাংবাদিক, মানুষের বঞ্চনা সইতে পারেন না। তাই আমার এই রাগ রাগিনীর প্রতি বিরাগে আপনার মনে প্রশ্নের ঝড় উঠেছে। কিন্তু বিশ্বাস করুন বাবুজী, আমার জীবনের এ একান্ত কথা আমি কাউকেই বলিনি, লোকে যতটুকু জানে সেইটুকুই সব নয়। আমি কথা দিচ্ছি, আপনাকে আমি আমার সব কথা বলব। কিন্তু বাবুজী, আজ আমি মনে মনে বড় দুর্ব্বল বোধ করছি। আপনাকে সবই বলব কিন্তু এখানে নয় বাবুজী। দূর থেকে তাজমহলের বর্ণনা শুনলে কি তাজের আড়ালে যে দুটি প্রেমিক-হৃদয়ের নিগূঢ় ভালবাসার সৌরভ লুকানো আছে তা ঠিক ঠিক উপলব্ধি করা যায় ? যায়না। আর যায় না বলেই দেশ দেশান্তর থেকে লোক ছুটে আসে তাজের কাছে। আপনাকেও যেতে হবে বারানসীতে—যেখানে আমার কাউকেই না-বলা কাহিনীর সৌরভ ছড়িয়ে আছে।

সেইখানে গিয়ে বলব আপনাকে আমার সব কথা—অন্তর উজাড় করে দিয়ে বলব। আপনি যাবেন বাবুজী ?

আগ্রহাকুল স্বরে শেষ কথাটা বলে আমার হাত জড়িয়ে ধরলেন অন্ধ ওস্তাত। আমি বললাম ঃ

—যাব বৈ কি ওস্তাতজী। আপনার কাহিনী শোনবার জন্য আমি যে অধীর হ'য়ে আছি। কবে যেতে চান বলুন, আমি অফিস থেকে ছুটি নিয়ে নেব।

—যেদিন আপনার সুবিধা, সেদিনই চলুন।

—তবে পরশু, সোমবার থেকে ছুটি নিয়ে নেব, মঙ্গলবার বেনারস এক্সপ্রেসে···

—না না বাবুজী, ও গাড়ীটা বড় ধিকি ধিকি করে যায়। তার চেয়ে পাঞ্জাব মেলেই যাব আমরা।

—বেশ, তাই ঠিক রইলো।

—বাঃ বেশ, আমার অতিথির সঙ্গে তুমি ত' কথায় মেতে উঠলে, খাবার যে ওদিকে ঠাণ্ডা মেরে গেল ?

বললেন মঞ্জুলা।

—হ্যাঁ, ভারী অন্যায়, সত্যিই ত', ভাবীজী কত যত্ন করে এসব তৈরী করেছেন আর আমরা কিনা···কিছু ভাববেন না ভাবীজী, আপনার সব খাবার আমি শেষ ক'রে দিয়ে যাব। তবে খুশী ত' ?

—আচ্ছা, আচ্ছা !

হাসতে হাসতে বলেন মঞ্জুলা।

আহার শেষ হবার পর অনেকক্ষণ ধরে নানা বিষয়ে গল্পগুজব চলল আমাদের মধ্যে। রাত প্রায় দশটার কাছাকাছি ওস্তাদকে

নিয়ে এলাম তাঁর বাসাবাড়ীতে। সেখানে দেখা হ'ল পণ্ডিত কামতা প্রসাদের সঙ্গে। তিনি পরদিনই বেনারস ফিরে যাচ্ছেন বলে জানালেন। আমার সামনেই তাঁকে জানান হ'ল যে, অন্ধ ওস্তাদ মঙ্গলবার আমাকে সঙ্গী ক'রে বেনারস ফিরছেন।
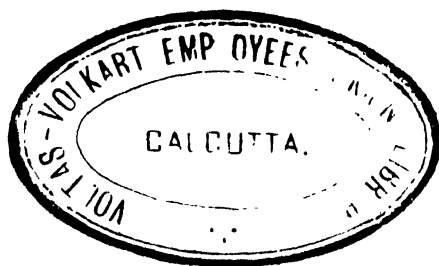
অফিসে আমার অনেক ছুটি পাওনা ছিল। তাই ছুটি পেতে বেগ পেলাম না। সতীর্থরা কৌতূহলী হ'য়ে উঠল হঠাৎ বেনারস যাচ্ছি শুনে। কেননা দেব-দ্বিজে আমার বিশেষ ভক্তি-শ্রদ্ধা আছে এমন প্রমাণ তারা অতীতে পায় নি। তাই বাবা বিশ্বনাথের রাজত্বে কেন যাচ্ছে আমার মত প্রায়-নাস্তিক লোকটি—সে জন্য তাদের কৌতূহল হওয়া এমন কিছু বিচিত্র নয়।

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় আমরা উভয়ে পাঞ্জাব মেলের দ্বিতীয় শ্রেণীর একটি কামরায় চেপে বসলাম। গাড়ী ছাড়ল যথাসময়ে। জমাট অন্ধকারের বুক চিরে, বিস্তীর্ণ প্রান্তর, সবে লাগান সবুজ শস্যশোভিত কৃষিক্ষেত্র, তাল নারিকেলের বন পেরিয়ে পাঞ্জাব মেল ছুটে চলল তার গন্তব্য-পথে। তার গতির চেয়েও যে আমার মনের গতিবেগ বহুগুণ বেশী ছিল তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু বেনারস সম্পর্কে আমার পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা না থাকায় মন ছুটে যেয়ে স্পষ্ট কোন রূপের সঙ্গে পরিচিত হতে পারল না। রাত্রি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি ছুটি বার্থে আমাদের বিছানা ক'রে নিলাম। তারপর একটা সাপ্তাহিক পত্রিকা হাতে নিয়ে শুয়ে পড়লাম। অন্ধ ওস্তাদ কেমন যেন গুম্ হয়ে আছেন, কোন কথাই বলছেন না। বোধ হয় মনের সঙ্গে কোন কিছু বোঝাপড়া করে নিচ্ছেন। আমি তাঁকে বিরক্ত করলাম না। কেন না বাইরের দৃষ্টি যখন হারিয়েছেন, মনের দৃষ্টিতেই ত' তাঁকে সবকিছু বিচার করে দেখতে হবে। আর এজন্য মৌনতা যে একান্ত অপরিহার্য্য তা আমি জানতাম।

আমার যখন ঘুম ভাঙ্গলো, পাঞ্জাব মেল তখন মোগলসরাই-

অংশনে ইন করছে। অনেকটা বেলা হ'য়ে গেছে দেখে মনে মনে লজ্জিত হলাম। পাশের বার্থে চেয়ে দেখলাম অন্ধ ওস্তাদ জানালা দিয়ে বাইরের দিকে মুখ ক'রে বসে আছেন।

—ওঃ অনেকটা বেলা হয়ে গেছে!

আড়মোড়া ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে অনুচ্চস্বরে বলতেই অন্ধ ওস্তাদ আমার দিকে মুখ ঘুরিয়ে মৃদু হেসে বললেন :

—বাবুজীর ঘুম ভাঙ্গলো?

—ভাঙ্গলো বটে, কিন্তু বেশ বেলায়, প্রথম রাতে ঘুম হয়নি কিনা।

উঠে পড়ে ওস্তাদজীকে প্রাতঃকৃত্যের সরঞ্জামাদি এগিয়ে দিয়ে রেষ্টুরেণ্ট কারের কোন এক বয়ের উদ্দেশ্যে নেমে পড়লাম। তার খোঁজে কিন্তু এগোতে হল না; একজন হঠাৎই আবির্ভূত হয়ে আমার অর্ডার নিয়ে গেল—চা, টোষ্ট, ওমলেট-এর।

মোগলসরাইয়ে অনেকক্ষণ ষ্টপেজ। নির্দিষ্ট সময় অন্তে গাড়ী গতিশীল হ'ল। কয়েক মিনিট বেশ বড পর একটা ব্রিজের উপর গাড়ী উঠতেই অন্ধ ওস্তাদ বললেন :

—বাবুজী, এইটাই হল কাশীর গঙ্গা। এই ব্রিজটা ভাল করে দেখুন, এর একটা বৈশিষ্ট্য আছে। আমাদের ট্রেন চলেছে নীচ দিয়ে আর এর উপর দিয়ে চলে গেছে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড—গাড়ী, ঘোড়া, পথচারীরা ঐ উপর দিয়ে যায়।

জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে দেখলাম যে তাঁর কথা অমূলক নয়।

পুল পেরিয়েই কাশী ষ্টেশন। আমি বেনারস এসে গেছে ভেবে উঠে পড়ে 'কুলি কুলি' বলে ডাকতেই অন্ধ ওস্তাদ সসব্যস্তে বললেন :

—সে কি বাবুজী, এখানে নয়, বেনারস যে এর পরের ষ্টেশন! আপনাদের বাঙ্গালীরা বেনারসকে কাশী বলেন বলে অনেকেই এ ভুল করেন। কিন্তু আমরা বলি বারানসী—"অস্‌সি" আর "বরুণা" নদী বিধৌত স্থান বলে।

বেনারস ক্যান্টনমেণ্টে গাড়ী প্রবেশ করতেই দু'তিন জন লোক আমাদের কামরার কাছে ছুটে এলো। তাদের মধ্যে একজন বেশ ধোপদুরস্ত খদ্দরের পায়জামা ও পাঞ্জাবী পরিহিত। লোকটি এগিয়ে এসে অন্ধ ওস্তাদকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতেই তিনি বললেন ঃ

—কৌন হো ?

—ম্যায় হুঁ শঙ্কর পরসাদ, আপকা মুনিম।

—জিতা রহো। ফিটন লে কর আয়া হ্যায় ?

—হাঁ জি।

—চলিয়ে বাবুজী। কৈলাশ ?

—মালিক!

জনৈক ভৃত্য সাড়া দিয়ে এগিয়ে আসে।

—সামান উমান জেরা খেয়াল করকে লে আনা, সামঝা ?

—জি, মালিক।

অতঃপর আমরা শঙ্কর প্রসাদকে অনুসরণ করে ষ্টেশন ইয়ার্ডের বাইরে এলাম। দেখলাম অদূরে একটি তেজী আরবদেশীয় ঘোড়া জোতা ফিটন অপেক্ষমান। শঙ্কর প্রসাদ অন্ধ ওস্তাদকে হাত ধরে গাড়ীতে তুলে দিলে তিনি আমার উদ্দেশে বললেন ঃ

—আইয়ে বাবুজী, আসুন ?

আমি ফিটনে চেপে তাঁর পাশে বসলাম। শঙ্কর প্রসাদও

সম্মুখের আসনে উপবেশন করল। ইতিমধ্যে মালপত্র তোলা হয়ে গেছে পেছনে। কৈলাশ পেছনে উঠে দাঁড়াতেই সইস বলগা ধরে আকর্ষণ করল। সঙ্গে সঙ্গে তেজী ঘোড়াটি ঘাড় বেঁকিয়ে ছুটতে লাগলো পথ বেয়ে।

পনের বিশ মিনিট পরেই একটি প্রাসাদোপম দ্বিতল অট্টালিকার সম্মুখস্থ গেট দিয়ে ফিটনটি প্রবেশ করল। গেটের গায়ে মার্বেল ফলকে খোদিত রয়েছে ঃ

SHARNGDEV CHOWDHURY

Jaminder

Mahmurgunj

ফিটন দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম, যে লোক এমন তেজী ঘোড়ার ছোলা-জল যোগান তাঁর অবস্থা বিশেষ সচ্ছল না হ'য়ে যায়না! আর বাড়ী দেখে বুঝলাম যে এঁরা সত্যিকারের জমিদার ও 'রইস' অর্থাৎ অভিজাত।

ফিটন থেকে নেমে পড়তেই অন্ধ ওস্তাদ আমায় নিয়ে এলেন একটি বড় সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে। বললেন ঃ

—এই কামরায় আপনি থাকবেন, বাবুজী।

ইতিমধ্যে কৈলাশ আমার হোল্ডঅল ও সুটকেশ নিয়ে এলো। তার পায়ের শব্দে তাঁকে আঁচ করে অন্ধ ওস্তাদ বলেন ঃ

—কৈলাশ, বাবুজিকা উপর খেয়াল রাখনা, সামঝা ?

—জি মালিক।

—আপনি বিশ্রাম করুন, একটু পরেই স্নানের ব্যবস্থা ক'রে দেবে, কেমন ?

—আচ্ছা।

—আমি তবে অন্দর মহলে যাচ্ছি বাবুজী। এখানে যেন কোন সঙ্কোচ করবেন না। মনে করবেন এ আপনার ভাইয়েরই বাড়ী।

—না না! যখন যা দরকার হবে, বলব।

অন্ধ ওস্তাদ চলে গেলে আমি কক্ষের গদি আঁটা আরাম কেদারাটায় গা এলিয়ে দিলাম।

ষোড়শোপচারে মধ্যাহ্ণ আহার সম্পন্ন করলাম আমরা, উভয়ে একই ডাইনিং টেবিলে বসে। বাঙ্গালী ও উত্তর প্রদেশীয় উভয় প্রকার রান্নাই ব্যঞ্জনাদির তালিকায় স্থান পেয়েছিল। আবার ভাতও যেমন ছিল, তেমনি ছিল চাপাটীও। মধ্যাহ্ণ ভোজনের সময়েই কথা হয়েছিল যে, আহারের পর একটু বিশ্রাম সেরেই অন্ধ ওস্তাদ আমায় বারানসীর দর্শনীয় স্থানগুলি দেখাতে নিয়ে যাবেন।

যথাসময়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম বারানসী প্রদক্ষিণে। সঙ্গে চলল শঙ্কর প্রসাদ। ধর্ম্মার্থী ভারতের প্রাণের তীর্থস্থান বারানসীর সর্ব্ব অঙ্গ যেন ভক্তি-নামাবলীতে আবরিত। দেশ দেশান্তর থেকে আগত ভক্তি-বিহ্বল নরনারীরা এখানে সেখানে জোড় হাত কপালে ছুঁইয়ে এগিয়ে চলেছে। চোখে মুখে তাদের ভক্তির দ্যুতি জ্বলজ্বল করছে। অন্ধ ওস্তাদ প্রথমেই আমায় নিয়ে চললেন লঙ্কা অঞ্চলে অবস্থিত হিন্দু ইউনিভার্সিটিতে।

কয়েকশত বিঘা জমি প্রাচীর বেষ্টিত। সুউচ্চ ফটক দিয়ে চৌহদ্দিতে প্রবেশ করতে হয়। স্বর্গীয় পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের স্বপ্ন আজ বাস্তব রূপ নিয়েছে। কত দূর দূরান্তর থেকে যে তরুণরা আসে এখানে জ্ঞানান্বেষণে তার আর ইয়ত্তা নেই। প্রতিটি বিষয়ের অধ্যাপনার জন্য ভিন্ন ভিন্ন অট্টালিকা। এই ভাবে বিভিন্ন অট্টালিকায় রয়েছে আর্টস কলেজ, সায়েন্স কলেজ, এগ্রিকালচারাল কলেজ, স্যান্সক্রিট কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, কলেজ অব মিউজিক এণ্ড ফাইন আর্টস, আয়ুর্ব্বেদ কলেজ প্রভৃতি।

প্রত্যেকটি কলেজ বিল্ডিংয়ের সন্নিহিত রয়েছে ফুল বাগিচা। তাতে নানা ফুলগাছ পাতাবাহার ও ঝাউয়ের সমারোহ।

মেয়েদের জন্য ইণ্টারমিডিয়েট গার্লস কলেজও আছে একটা। তবে ছেলেদের জন্য ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ ইউনিভার্সিটি এরিয়ার বাইরে। পূর্ব্বের সেণ্ট্রাল হিন্দু স্কুল ভবনেই এখন সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়েছে। এইটিই হিন্দু ইউনিভার্সিটির অধীনস্থ ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ। জানলাম বেনারসের অবশিষ্ট কলেজ এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটির অধীন।

কলেজ বিল্ডিংগুলোর প্রায় প্রত্যেকটাতেই হিন্দু স্থাপত্যের নিদর্শন রয়েছে। প্রায় প্রত্যেক বিল্ডিংয়ের চূড়ার দিকটা মন্দিরাকৃতি। ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটির স্থান যে অনুল্লেখ্য নয়, তা ইউনিভার্সিটি পরিদর্শন না করলে বোঝা যায় না। প্রত্যেক দর্শকই সবিস্ময়ে লক্ষ্য না করে পারবে না যে, কতটা নিষ্ঠা ও শ্রম ব্যয় করে এমন একটি বিরাট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হয়েছে। এখন পর্য্যন্ত এর নানাদিকের উন্নতির প্রয়াস নিরবচ্ছিন্নভাবেই চলেছে। এখনও এখানে সেখানে বৃক্ষ রোপিত হচ্ছে, ইউনিভার্সিটির চৌহদ্দির পথঘাট কংক্রিট দিয়ে পাকা করা হচ্ছে। চারিদিকে বৃক্ষরাজি লাগিয়ে তরুণদের মনে সবুজ-সমারোহের স্পর্শ দেবার চেষ্টা চলেছে। বিরাট লাইব্রেরী, প্লে-গ্রাউণ্ড, সুইমিং পুল—কোন কিছুরই অভাব নেই।

অন্ধ ওস্তাদ জানালেন যে, পড়াশুনার ব্যাপারে এখানে খুবই যত্ন নেওয়া হয়। তাছাড়া এটা প্রায় আবাসিক ইউনিভার্সিটি বললেই চলে। এগারোটি হোষ্টেল রয়েছে ইউনিভার্সিটি কম্পাউণ্ডের ভেতরে। এর মধ্যে রুইয়া হোষ্টেল, ব্রোচা হোষ্টেল, বিড়লা হোষ্টেল, এস,

রাধাকৃষ্ণাণ হোষ্টেল, ডাঃ ভগবানদাস হোষ্টেল, মোরভি হোষ্টেল, দে হোষ্টেল ও লিম্বডি হোষ্টেলই প্রধান। প্রত্যেক হোষ্টেলের সম্মুখেই সুসজ্জিত পুষ্পোত্থান রয়েছে। হোষ্টেলের ব্যবস্থাদি দেখবার জন্য আমরা একটি হোষ্টেলে গেলাম। ছাত্ররা পরম শ্রদ্ধায় অন্ধ ওস্তাদকে স্বাগত জানাল ঃ

—শার্ঙ্গদেব ভাইয়া, আইয়ে, আইয়ে! তসরিফ লিজিয়ে!

শার্ঙ্গদেবকে একটি চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে ছাত্ররা আমায়ও বসতে অনুরোধ জানাল। আমি উপবেশন করলে শার্ঙ্গদেব বললেন ঃ

—আই জাষ্ট ইনট্রোডিউস ইউ অল উইথ মাই জার্ণালিষ্ট ফ্রেণ্ড শ্রীশেখর বসু।

সকলে আমার সঙ্গে নমস্কার বিনিময় করল। আমি সাংবাদিক সুলভ কৌতূহলে দু'চার কথায় ছাত্রাবাসের অবস্থাদি জেনে নিলাম। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের পরিচালন-পদ্ধতির প্রতি ছাত্রদের গভীর আস্থা রয়েছে জানলাম।

ইউনিভার্সিটি পরিক্রমা শেষ করে আমরা এলাম দুর্গাবাড়ীতে। শার্ঙ্গদেব বললেন ঃ

—বাবুজী, আপনাদের কলকাতায় যে দুর্গা পূজা হয়, তাতে চলে আলোকসজ্জা মাইক আর প্রতিমার প্রতিযোগিতা, কিন্তু আমাদের দুর্গাবাড়ীতে যে পূজা হয় এর প্রধান উপচারই হচ্ছে ভক্তি। নবমীর দিন স্থানীয় বাঙ্গালী এবং কিছু সংখ্যক রুচিশীল উত্তর প্রদেশীয়দের বাড়ীর মেয়েরা প্রত্যূষে গঙ্গায় স্নান করে নগ্নপদে, ভক্তি বিনম্র চিত্তে এখানে আসে প্রণাম জানাতে। তা ছাড়া বাঙ্গালী তরুণরা নানারূপ সাংস্কৃতিক উৎসবেরও আয়োজন করেন। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘেও খুব ধুমধাম ক'রে পূজা হয়। রামকৃষ্ণ মিশনের পূজাও দেখবার

মত। এখানে কিন্তু বাবুজী, বাঙ্গালী খুব কম নেই—প্রায় দেড় লক্ষের মত হবে। বাঙ্গালীটোলার দিকেই সাধারণতঃ [illegible] বাস বেশী।

অন্যান্য দর্শনীয় জিনিষের মধ্যে আমায় নিয়ে যাওয়া হ'ল জয়সিংহ প্রতিষ্ঠিত মানমন্দির, নেপালী স্বর্ণমন্দির, বেনারসের বিখ্যাত বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণা মন্দিরে। এখানে নানা চেষ্টা করেও কিন্তু পাণ্ডাদের হাত থেকে রেহাই পাওয়া গেল না। পাণ্ডাদের মুখে শোনা গেল যে অন্নপূর্ণা মন্দিরের মূর্ত্তিটি স্বর্ণ ও হীরা জহরৎ খচিত। অন্নকূটের সময় মাত্র তিন দিনের জন্য এই মূর্ত্তি দর্শন করা যায়। অন্যান্য সময় দ্বার বন্ধ থাকে। এই তিন দিনের মধ্যে দেবী-দর্শনের সৌভাগ্য হলে নাকি জীবনে অন্নকষ্ট হয় না!

আদি বিশ্বনাথ মন্দিরটি হিন্দু বিদ্বেষী মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেব কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হয় এবং সেটা মসজিদে রূপান্তরিত করা হয়। এখনও সে মসজিদে নিয়মিত পুলিশ পাহারা মোতায়েন থাকে। আজান দেবার সময় খুব জোরে শব্দ করা নিষেধ।

বেণীমাধবের ধ্বজাও আওরঙ্গজেব ভেঙ্গে মসজিদ নির্মাণ করেন। এখানকার দুটি মিনারের মধ্যে একটি ভেঙ্গে গেছে গত ১৯৪৯ সালে।

পথে আমরা কয়েকটি ঘাটও দেখে নিলাম। এই ঘাটগুলির মধ্যে দশাশ্বমেধ ঘাট, হরিশচন্দ্র ঘাট, অহল্যাবাঈ ঘাট, চৌষট্টি ঘাট, দ্বারভাঙ্গা ঘাট, মণি-করণিকা ঘাট প্রভৃতিই প্রধান। গঙ্গার ওপারে দেখা যায় রামগড় দুর্গ। ওখানেই কাশীরাজের প্রাসাদ।

এ ছাড়া আমরা দেখতে গেলাম ব্যাসকাশী। কিংবদন্তী আছে যে ব্যাসদেব কাশী স্থাপিত করলে মা দশভুজা চিন্তিত হয়ে পড়েন—

ব্যাপকো॥ বিশ্বনাথের কাশীর প্রভাব সংকোচ করতে পারে ভেবে অনেক ভেবেচিন্তে একদিন তিনি বৃদ্ধার ছদ্মবেশ ধারণ করে ব্যাসদেবের নিকট গমন করেন। ব্যাসদেব তখন কোন কার্য্যে বিশেষভাবে নিমগ্ন ছিলেন। বৃদ্ধাবেশধারিণী মা দুর্গা তাঁকে শুধান :

—আচ্ছা বাবা, এ কাশী দর্শনে কি ফললাভ হয় ?

—অক্ষয় স্বর্গ লাভ হয়।

বলেন ব্যাসদেব।

বৃদ্ধা কানে খাটো। তাই পুনরায় জিজ্ঞেস করেন :

—কি বললে বাবা, কি লাভ হয় ?

—এ কাশী দর্শনে অক্ষয় স্বর্গ লাভ হয়।

—ঠিক শুনতে পেলাম না বাছা! একটু স্পষ্ট করে বল।

কানের পিঠে হাত দিয়ে শুধান বৃদ্ধা।

ব্যাসদেবের তখন ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটেছে। তিনি বিশেষ কুপিত হয়ে বলেন :

—এখানকার মন্দির দর্শনে গর্দ্দভ জন্ম লাভ হয়।

শোনামাত্রই দেবী আপন মূর্ত্তি ধারণ করে কল্যাণের ভঙ্গিতে হস্ত উত্তোপন পূর্ব্বক বললেন :

—তথাস্তু !

ব্যাসদেবের সকল বাসনা মুহূর্ত্তের ভুলে নির্মূল হয়ে যায়।

বাঙ্গালীটোলা স্কুল গৃহের পশ্চাতে তিলভাণ্ডেশ্বর দর্শন করলাম। কিংবদন্তী আছে এই মূর্ত্তি প্রতিদিন তিল পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

দেখলাম আমরা তুলসী ঘাট। প্রবাদ আছে, একদা তুলসীদাস কোন রামনাম কীর্ত্তণ সভায় গুরুর নির্দ্দেশে মনুষ্যমূর্ত্তিধারী

শ্রীহনুমানের সাক্ষাৎ পান। তিনি তখন রামদর্শনের জন্য অনুনয় করে শ্রীহনুমানের পদপ্রান্তে পতিত হন! শ্রীহনুমান কোনরূপেই শ্রীতুলসীদাসকে প্রতিনিবৃত্ত করতে না পেরে জানান যে, রাম-নবমীর দিনে তিনি যেন কাশীর গঙ্গায় খেয়া পারাপার করেন, সেই খেয়ায় শ্রীরামের দর্শন পাবেন।

রামনবমীর দিন প্রত্যুষ থেকে তুলসীদাস খেয়া পারাপার করতে লাগলেন। কত লোক ওপার থেকে এপারে এলো, আবার এপার থেকে গেল ওপারে। এমনি করে পল দণ্ড অতিক্রান্ত হয়ে গভীর নিশি নেমে এলো পৃথিবীতে। রাত্রি গভীর হতে থাকলে লোক চলাচল বন্ধ হয়ে গেল। গভীর নৈরাশ্যে ভেঙ্গে পড়লেন তুলসীদাস। উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করতে লাগলেন—'হা রাম, হা রাম' বলে। অবশেষে দেবতার দয়া হল। তিনি সশরীরে দর্শন দিয়ে বললেন ঃ

—ভক্ত তুলসীদাস, আমি তোমার খেয়ায়ই কাশীর গঙ্গা পার হয়েছি, কিন্তু বৎস তুমি আমায় চিনতে পারনি। তুলসীদাস নয়ন-মন সার্থক করে দেখলেন সেই নব-দুর্ব্বা-দল নিভ রাম মূর্ত্তি।

এরপর আমরা দেখলাম তুলসীদাস প্রতিষ্ঠিত শঙ্কট মোচন। এখানে পাশাপাশি রাম ও হনুমান মন্দির অবস্থিত।

বেনারসের দর্শনীয় মন্দির ও স্থান দেখা শেষ করে আমাদের ফিটন চলল সারনাথের দিকে—বারানসী থেকে সাত মাইল দূরে।

পথে পড়ল ভারতমাতার মন্দির। মন্দিরে কোন মূর্ত্তি নেই, তার পরিবর্ত্তে স্থান পেয়েছে শ্বেতপাথর নির্মিত ভারতবর্ষের একটি অপূর্ব্ব মানচিত্র। এ মন্দিরের যুগোপযোগী পরিকল্পনা আমার বড় ভাল লাগল। মন্দিরের নামটিও হয়েছে সার্থক—ভারতমাতা মন্দির!

দেশকে এরা কত ভালবাসে তার প্রকৃষ্ট সাক্ষী হয়ে যুগ যুগ ধরে বিরাজ করবে এই ভারতমাতা মন্দির। মন্দিরের মেঝেতে প্রস্তর নির্মিত মূল মানচিত্র। এছাড়া দেয়ালগাত্রে বিভিন্ন মানচিত্রে বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন শাসকের আমলের ভারতের অবস্থা চিহ্নিত রয়েছে।

দেশমাতৃকার প্রতি ভক্তিপ্লুত অন্তরে আমরা বেরিয়ে এলাম ভারতমাতা মন্দির থেকে। আবার আমাদের ফিটন ছুটে চলল সারনাথের পথে।

সারনাথ ষ্টেশনের কাছাকাছি একটা উঁচু টিলার উপরে একটা গোলাকৃতি বহু প্রাচীন পাকা ঘর অবস্থিত। স্থানীয় লোকদের ধারণা এ ঘরটিতেই রাম-সোহাগিনী জনকনন্দিনী সীতা রান্না করতেন। আবার কারও কারও মতে এই পর্য্যন্ত ছিল কাশী রাজ্যের সীমা। ঐ উঁচু ঘর থেকে রাজসৈন্যরা বহিঃশত্রুর আক্রমণের প্রতি নজর রাখতো। সন্দেহভাজন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে পেলে বন্দী করে শাস্তির ব্যবস্থা করত।

অপর কারও কারও মতে মুঘল সম্রাট হুমায়ুন একবার এই স্থান পরিদর্শন ক'রেছিলেন—তাঁরই স্মরণী হিসাবে সম্রাট আকবর এই স্মৃতি-গৃহ নির্মাণ করেছেন। কক্ষের মেঝে খুঁড়ে নাকি উর্দ্দু অক্ষরে এই কথা লেখা প্রস্তরফলকও পাওয়া গেছে। সরকারী গাইড বইয়েও নাকি শেষোক্ত ঘটনাকে সত্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের মহাতীর্থস্থান সারনাথে যখন আমাদের ফিটন এসে থামল, তখন বেলা বাজে প্রায় চারটে। প্রথমে আমরা প্রবেশ করলাম 'চাইনিজ টেম্পল'-এ। এমন একটা ভক্তিশুদ্ধ পরি-

বেশ খুব কম মন্দিরে দেখা যায়! প্রবেশমুখে ভিক্ষুদের জন্য নির্মিত কক্ষে জন দুই চাইনিজ ভিক্ষুকে দেখলাম। প্রশস্ত মন্দিরগৃহের মধ্যস্থলে শ্বেত পাথরের বিরাট তথাগত মূর্তি। সম্মুখে প্রজ্বলিত প্রদীপ ও ধূম্রাধার। পূতগন্ধে মন্দিরের বাতাস ভরপুর। দেয়ালে টাঙান রয়েছে কতকগুলি চিত্রপট—তাতে ভগবান বুদ্ধের জন্মকাল থেকে সারনাথে এসে তাঁর ধর্মবাণী প্রচার পর্য্যন্ত সকল বিষয়ই স্থান পেয়েছে। তবে এই সকল চিত্রে ভারতীয় ভাবধারা বড় একটা ফুটে ওঠেনি—ইউরোপীয় ভাবটাই বড় বেশী প্রকটিত। দর্শনার্থীদের বিরাম নেই। এক দল দর্শনার্থীর সঙ্গেকার এক বালিকা জোরে চিৎকার করে উঠতেই তার সে চিৎকার ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরল অনেকক্ষণ। জনৈক দর্শক মন্দিরে রক্ষিত বিরাট ড্রামটায় আঘাত করায় গম্ভীর নাদ উঠে তা প্রতিধ্বনিত হল অনেকক্ষণ ধরে।

এরপর আমরা এলাম 'মুল গন্ধ কুঠি বিহার'-এ। এটাই সারনাথের মূল মন্দির। এ মন্দিরের বুদ্ধ মূর্ত্তিটি স্বর্ণবর্ণের। মূর্ত্তির সামনে দাঁড়িয়ে মোহাবিষ্টের মত মনে মনে না আউড়িয়ে পারলাম না :

বুদ্ধং শরণং গচ্ছা-য়া-মি

ধর্মং শরণং গচ্ছা-য়া-মি

সংঘং শরণং গচ্ছা-য়া-মি

মন্দিরের গাত্রে মানুষ পরিমিত বহু চিত্রে ভগবান তথাগতের জীবনের স্মরণীয় ঘটনাবলী সম্পূর্ণ ভারতীয় ভাবধারায় অঙ্কিত রয়েছে। এঁকেছেন জাপানী চিত্রশিল্পী কোসেৎসু নসু।

এরপর দেখলাম আমরা সুপ্রাচীন 'ধামেক স্তূপ'। স্তূপের কতকাংশ পুনর্নির্মিত হয়েছে সম্প্রতি।

সারনাথ মন্দিরের চতুষ্পার্শে ইতস্তত বহু প্রস্তর নির্মিত বেদী রয়েছে। অনেকে বলছেন যে এখানেও এককালে নালন্দার মত বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। ঐ বেদীর উপরে শ্রমণরা পড়াশুনা করতেন।

অতঃপর আমরা সারনাথের যাদুঘর দেখলাম। এখানে মূল অশোক স্তম্ভটি রক্ষিত হয়েছে বলে জানাল আমাদের গাইড।

অপূর্ব্ব শিল্পপ্রতিভার ছাপ রয়েছে স্তম্ভের চারিটি সিংহ মূর্ত্তিতে। সিংহ মূর্ত্তি চতুষ্টয়ের নীচেই অশোক চক্রের ফাঁকে ফাঁকে অশ্ব, সিংহ, ব্যাঘ্র ও ষাঁড় মূর্ত্তি খোদিত রয়েছে। এ কথা হয়তো অনেকেই জানেন না। সারনাথে খননকার্য্য চালিয়ে আবিষ্কৃত অনেক বুদ্ধ মূর্ত্তি ও তদানীন্তন কালের নানারূপ মূর্ত্তি, প্রস্তর নির্মিত বস্তুসামগ্রী এই মিউজিয়ামে অতি যত্নে রক্ষিত হয়েছে। এই সকল সামগ্রী মনোযোগ দিয়ে দেখতে দেখতে মন চলে যায় আজ থেকে বহু বর্ষ আগের ভারতে। মনে আলোড়ন ওঠে তাদের সম্বন্ধে কত কিছু জানতে।

মিউজিয়াম দেখা শেষ করে আমরা এসে উঠলাম ফিটনে। ফিটন এগিয়ে চলল বারানসীর দিকে।

আমাদের নিয়ে ফিটন যখন শার্ঙ্গদেবের বাড়ীর ফটকে ঢুকছিল তার অনেক আগেই পৃথিবীতে সন্ধ্যা নেমে এসেছে। ফিটন ফটকে ঢুকবার অবসরে দেখলাম ফটকশীর্ষের বড় ঘষা কাচের বাল্বটা জ্বলে উঠল। ঠিক তার নীচেই দেবনাগরী হরফে লেখা রয়েছে দুটি কথা—**মালবিকা মঞ্জিল**।

আবার সেই মালবিকা! কে এই মালবিকা—যে কিনা শার্ঙ্গদেবের প্রাসাদোপম মঞ্জিলের ললাটশীর্ষে নিজের স্থান করে নিতে পেরেছে?

কিছুক্ষণ বিশ্রাম করার পরই পরিচারিকা এসে জানাল যে স্নানের জোগাড় দেওয়া হয়েছে। গাত্রোত্থান করে স্নানের ঘরে চললাম। বাথরুমে সব কিছুই সাজান ছিল—মায় আমি যে কাপড়টা এখন পরব, সেটা অবধি। এই কয়েক ঘণ্টায়ই আমি বুঝে নিয়েছিলাম যে এবাড়ীর নিম্নতম বেতনের দাসীটি অবধি তার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কত সচেতন। কথা বলা যেন এখানে বারণ। সকলেই মুখ বুজে কর্ত্তব্য করে চলেছে। কোথাও এতটুকু ত্রুটি নেই। কেমন একটা থম্‌থমে্‌ ভাব যেন এ বাড়ীর ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

স্নান সেরে ঘরে এসে দেখলাম, টেবিলের উপর আমার জন্য সান্ধ্যরাশ সাজান রয়েছে। মাথায় চিরুণী চালিয়ে অবিন্যস্ত চুলগুলোকে বশে এনে, টার্কিস টাওয়েল দিয়ে হাত-মুখ মুছে নিয়ে নিজের গরজেই খাবার টেবিলে এসে বসলাম। কেননা আমার এই ক'ঘণ্টার অভিজ্ঞতায়ই বুঝতে পেরেছি যে খাবার জন্য আমায় কেউ অনুরোধ করতে আসবে না। ওরা জানে যে অনুরোধ করতে এলে আবার কথা খরচ করতে হবে, তবেই এই শান্ত সমাহিত মালবিকা মঞ্জিলের নিশ্ছিদ্র নিশ্চুপতায় ছেদ টানা হবে।

আহার শেষ হওয়ামাত্রই জনৈকা পরিচারিকা এলো বাসনপত্র নিয়ে যেতে। দেখে অবাক্ হয়ে গেলাম। ঠিক আহার শেষ হওয়ামাত্রই এলো! একটু আগেও না বা একটু পরেও না। জানলো কি করে? নাকি এই অদ্ভুত বাড়ীতে এমন কোন ব্যবস্থা আছে যাতে যে যা করছে সব জানা সম্ভব হয় কোনরূপ বাক্যব্যয় না করেই?

পরিচারিকা একমনে এঁটো বাসন গুছোচ্ছিল, এমন সময় আমি হঠাৎই তাকে জিজ্ঞেস করে বসলাম:

—কেয়া নাম তুম্‌হারা ?

—লছমী।

—আচ্ছা লছমী, তুমহারা মালিক জী অব কেয়া কররহা হ্যায় ?

—দেবীজী-কো ধ্যান কররহা হ্যায়, বাবুজী !

—দেবীজী ! ও কৌন ?

—ক্ষমাকিজিয়ে বাবুজী। ইস্‌সে জ্যায়দা ম্যায় বোলনে নেহি সাকেগে।

কথা শেষ করেই হু'হাতে ট্রেটা তুলে নিয়ে আনতমুখে দ্রুতপদে চলে গেল লছমী।

আমি অবাক হ'য়ে ভাবতে থাকি, কি এমন কারণ থাকতে পারে যে জন্য এ বাড়ীর লোকদের বেশী কথা বলতে মানা ? আর এরূপ নির্দ্দেশই বা এদের দিল কে এবং কেন ? অনেকক্ষণ ধরে ভেবেও কোন কূলকিনারা পেলাম না। কিছুক্ষণ পর বাতায়ন পথে পূর্ণিমার জ্যোৎস্নার আহ্বানে বাইরে চলে এলাম।

মালবিকা মঞ্জিলের ফটক ও অট্টালিকার মাঝখানে বিস্তৃত বাগিচা। কত রকমের ফুল গাছই না ওতে স্থান পেয়েছে। নৈশ আবহাওয়ায় যে ফুলগুলির সৌরভ এদিক সেদিক থেকে আমার নাকে এলো তার মধ্যে রজনীগন্ধা, আর হাসনাহেনাই প্রধান। এক পা এক পা করে বাগিচার ভেতরে চলে এলাম। তারপর সেই জ্যোৎস্নার আলোকধারাস্নাত বাগানের গ্র্যাভেল বিছান সরু পথে পায়চারি ক'রে ফিরতে লাগলাম। মাঝে মাঝে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলাম বোবা হয়ে দাঁড়ান মালবিকা মঞ্জিলের দিকে। মনে মনে ভাবতে লাগলাম এত কৌতূহলের কোন উত্তরই কি লেখা নেই এই অট্টালিকাগাত্রে ?

কতক্ষণ এইভাবে পায়চারি করে ফিরেছিলাম খেয়াল ছিল না। এক সময় পদযুগলে শ্রান্তি অনুভব করলাম। তথাপি এমন পুষ্পগন্ধ সুবাসিত গন্ধবহ ও আকাশ-মাটিতে মিতালি পাতানো শুভ্র সুন্দর জ্যোৎস্নালোকের মোহ থেকে মনকে মুক্ত করতে পারলাম না। এক সময় বাগানের এক কোণের সান বাঁধান চত্বরে বসে পড়লাম। অল্প-ক্ষণের মধ্যেই মৃদু সমীরণের স্নেহ-ব্যঞ্জনে আমি তন্দ্রাচ্ছন্ন হ'লাম।

অনেকক্ষণ পর লছমীর ডাকে তন্দ্রা টুটে গেল। শুনলাম সে বলছে :

—বাবুজী, মালিকজী আপকো বুলায়া হায়।

লছমীকে অনুসরণ করে নিশ্চুপে এগিয়ে চললাম মালবিকা মঞ্জি-লের অন্দর মহলে। কিছুটা এসেই দ্বিতলে ওঠবার সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলাম। দ্বিতলে উঠে বারান্দাপথে হেঁটে চার পাঁচটা তালাবদ্ধ ঘর অতিক্রম করে দক্ষিণমুখী একটা কক্ষের অর্দ্ধ-উন্মুক্ত দরজায় এসে দাঁড়ালাম। ঘরের ভেতর থেকে তখন ধূপ ও গুগ্‌গুলের মনোরম সুগন্ধ ভেসে আসছে। একটু দাঁড়িয়ে থেকে লছমী স্বরে অত্যন্ত সম্ভ্রম মিশিয়ে বলল :

—মালিকজী, বাবুজীকো লে আয়া হ্যায়।

—ও, অচ্ছা অব তু জানে সাক্তা।

বলতে বলতে শার্ঙ্গদেব দরজা উন্মুক্ত করে বাইরে এলেন। দেখলাম তাঁর নগ্ন পদ, চোখে মুখে ভক্তিবিনম্র এক অনন্য প্রশান্তি। পরণে পট্টবস্ত্র, গায়ে রেশমি চাদর। আমাকে আহ্বান জানিয়ে বললেন :

—দেখুন বাবুজী, এই হ'ল আমার দেবীজী মন্দির।

ঘরের ভেতর তাকিয়ে দেখলাম কারুকার্য্য খচিত মূল্যবান বস্ত্রাংশে আচ্ছাদিত কাষ্ঠ-বেদীর উপরে রক্ষিত হ'য়েছে এক সুস্মিত নারীমূর্ত্তির প্রমাণ মাপের অয়েল পেণ্টিং। গলদেশে অর্পিত হ'য়েছে পুষ্পমাল্য। আশে পাশে কয়েকটি ফ্লাওয়ার ভাস-এ রজনীগন্ধার গুচ্ছ। দু'পাশে দুটি বেশ বড় বড় প্রদীপ জ্বলছে। ধূপদানিতে পুড়ছে সুগন্ধি ধূপ। বেশ একটা শ্রদ্ধা-পবিত্র পরিবেশ। দেখে মন আবিষ্ট হয়ে আসে।

মনের মাঝে প্রশ্ন উঁকি মারল—ইনিই কি তবে মালবিকা মঞ্জিলের অধিষ্ঠাত্রী দেবীমূর্ত্তি? হ্যাঁ, এমন ভুবনভোলান রূপের অধিকারিণীকে 'দেবীজী' ছাড়া আর কোন্ বিশেষণেই বা অভিহিত করা যায়? মুখে চোখে তার অপূর্ব্ব এক দীপ্তি, ঠোঁটের কোণে মিষ্টি মধুর এক চিলতে হাসি, আয়ত চক্ষু, উন্নত নাসিকা, সুচিক্কণ ওষ্ঠাধর, আজানুলম্বিত অলকগুচ্ছ, সারাদেহে যৌবনের সুষমা। এমন রূপ কি কোন মানবীর হ'তে পারে? মনে মনে ভাবলাম, সার্থক হয়েছে এঁর 'দেবীজী' নাম!

শার্ঙ্গদেব অতি সন্তর্পণে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে তাতে সযত্নে শিকল তুলে দিলেন। তারপর আমার দিকে ঘুরে থম্‌থমে স্বরে আহ্বান জানালেন:

—আসুন বাবুজী!

আমি নিঃশব্দে তাঁকে অনুসরণ করলাম। এতক্ষণে বুঝলাম, এ বাড়ীতে শান্ত সমাহিত পরিবেশের সত্যই প্রয়োজন আছে। কিছুটা এগিয়েই শার্ঙ্গদেব একটা বন্ধ ঘরের তালা খুললেন। আমরা উভয়ে প্রবেশ করলাম সে ঘরে। দেখলাম, অতি যত্নসহকারে কোন প্রথম শ্রেণীর দোকানের মত কাঁচের শো-কেসে থরে থরে

সাজান রয়েছে নানা রকমারি বর্ণাঢ্য সাজ-পোষাক। বর্ণে, কারুকার্য্যে কোনটাই কোনটার সমগোত্রের নয়। বেশীর ভাগ পোষাকই নৃত্য-শিল্পীদের উপযোগী। একটু এগিয়ে কাছে যেয়ে দেখলাম যে, প্রত্যেকটা পোষাকেই তার পরিচয় সম্বলিত টুকরো টুকরো কাগজ অাঁটা রয়েছে। একটায় লেখা রয়েছে, 'কচ ও দেবযানী' আর একটায় 'মীরাবাঈ', একটায় 'কথক নাচ' কোনটায় বা 'শ্যামা' অথবা 'চণ্ডালিকা'। এমনি বহুপ্রকারের পোষাক সজ্জিত রয়েছে সারি সারি অতি যত্নে। শো-কেসে নৃত্যশিল্পীদের আবশ্যকীয় বহুপ্রকারের জরির অলঙ্কার ও কয়েকজোড়া ঘুঙুরও রক্ষিত দেখলাম।

—সব দেখলেন বাবুজী ?

—হাঁ ওস্তাদজী।

—এ সবই মালবিকার পোষাক।

শুনে মনের মধ্যে আমার মালবিকা সম্বন্ধে অনেক প্রশ্নই ভীড় করে এলো। একবার ভাবলামও শার্ঙ্গদেবকে জিজ্ঞেস করি—কিন্তু তাঁর মুখের দিকে চেয়ে একটা জমাট বিষাদ দেখে প্রশ্ন করতে পারলাম না। ঘরের সবকিছু দেখে নিয়ে শার্ঙ্গদেবকে অনুসরণ করে বাইরে চলে এলাম। শার্ঙ্গদেব দরজা বন্ধ করে তাতে তালা মারলেন। এগিয়ে গেলেন পাশের ঘরে। দরজা উন্মুক্ত করে ভেতরে ঢুকলেন। আমিও তাঁকে অনুসরণ করলাম। এ ঘরে ঢুকে দেখলাম থরে থরে সাজান রয়েছে বহু প্রকারের বাদ্যযন্ত্র—বীণা, তানপুরা, হারমোনিয়াম, সারেঙ্গী, বাঁয়া, তবলা, বাঁশী, ড্রাম, জিপসী ড্রাম, বীণা ও আরও এতপ্রকারের বাদ্যযন্ত্র রয়েছে, যা ইতিপূর্ব্বে দেখিনি আমি। তাই নামও জানি না। শার্ঙ্গদেব এগিয়ে গিয়ে একটা তানপুরার তারে আঙুলের স্পর্শ লাগাতেই সেটা ঝন্‌ঝন্‌

করে বেজে উঠে ঘরের নৈঃশব্দ ভঙ্গ করল। অবশ্য কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই সে স্বর মিলিয়ে গেল ইথারতরঙ্গে। সূচীভেদ্য জমাট অন্ধকারে একটা দিয়াশলাইয়ের কাঠি জ্বলে উঠেই যেন বাতাসের ফুৎকারে নিভে গেল।

—বাবুজী, আমি এই তানপুরাটা বাজাতাম।

বললেন শার্ঙ্গদেব। কথা শেষ করেই শার্ঙ্গদেব ধীর পায়ে বেরিয়ে এলেন। আমিও। বাইরে এসেই দরজায় তালা আটকিয়ে দিলেন। এরপর এগিয়ে চললেন একতলায় নামবার সিঁড়ির দিকে। আমিও তাঁকে অনুসরণ করে এগিয়ে চললাম।

একতলায় নেমে এগিয়ে গেলেন তিনি বাগানের দিকের বারান্দায়। এই বারান্দায় একটা বেশ চওড়া ও প্রস্থ চত্বর ছিল। সেটার কাছে এগিয়ে গিয়ে বললেন ঃ

—বাবুজী, এই যে বেদীটা দেখছেন, এখানে বসেই আমি রেওয়াজ করতাম। মাসের পর মাস কত প্রহর কেটে গেছে যে আমার এই ব্যর্থ সাধনায়, তা ভাবলে আজ আমার সারা মন ব্যথায় ভরে ওঠে।

—ব্যর্থ সাধনা বলছেন কেন ওস্তাদজী ?

—ব্যর্থ নয়, বাবুজী ? যে সাধনা জগতের কারও কল্যাণে এলো না—বরং আমার জীবনে ডেকে আনল মহা এক অকল্যাণ, তাকে ব্যর্থ না বলে আর কি বলতে পারি বাবুজী ?

শার্ঙ্গদেবের গলাটা কেমন যেন ধরে এলো। তাঁর এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। কারণ তাঁর জীবনের কোন ঘটনা সম্পর্কেই আমি তখনও ওয়াকিবহাল নই। তাই বললাম ঃ

—আপনার সব কাহিনী না শোনা অবধি এ প্রশ্নের উত্তর দিতে ত পারছি না, ওস্তাদজী।

—সবকিছুই আপনাকে বলব বাবুজী, আর বলব আপনাকে কাল সকালেই।

কথা শেষ করে শার্ঙ্গদেব হাঁকলেন :

—কৈলাশ ?

—মালিক !

বলে সাড়া দিয়ে কৈলাশ ছুটে এলো।

—বাবুজীকো খানা দেনেকো বন্দবস্ত করো।

—খানা তৈয়ার মালিক।

—বাবুজী, আপনি এবার খেয়ে নিয়ে বিশ্রাম করুন। কাল ট্রেন-জার্নি গিয়েছে ; পরিশ্রান্ত আপনি।

বলে শার্ঙ্গদেব অন্দরের পথে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। তিনি চলে যেতে কৈলাশ আমায় ডাইনিংরুমে আহ্বান জানাল।

নৈশাহার শেষ ক'রে এসে বিছানার বুকে আশ্রয় নিলাম। কিন্তু চিন্তায় ভারাক্রান্ত মন নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘুমুতে পারলাম না। ঘুরে ফিরে কেবল একখানি হাসিস্নিগ্ধ সুন্দর মুখ মানসপটে ভেসে উঠে আমায় বিভ্রান্ত করতে লাগল। কিছুতেই তা আমার অক্ষিপত্রের আঙ্গনে নিদ্রাদেবীর আগমন সুগম করতে দিল না। এই নিশুতি রাত্রির নিস্তব্ধতার মাঝে কান পেতে আমার মনে হল, কার যেন দীর্ঘশ্বাস শুনতে পাচ্ছি। কার মনের একটা গভীর ব্যথা যেন বাতাসে ভর করে সারা বাড়িটায় ভেসে বেড়াচ্ছে।

কিন্তু কার বুকে এত ব্যথা ? এমন গভীর তপ্ত নিশ্বাস কি শার্ঙ্গদেবের ? না কি মালবিকা মঞ্জিলের অধিষ্ঠাত্রী দেবীজীর ?

কিন্তু ঐ হাসিস্নিগ্ধ মুখের অধিকারিণীর অন্তরেও কি পুঞ্জীভূত কোন বেদনা বাসা বাঁধতে পারে? সে বেদনা কত গভীর?

কিছুতেই এইসব চিন্তায় যখন চোখের পাতা এক হ'ল না, বিছানা ছেড়ে উঠে মাথায় ও মুখেচোখে জল ছিটিয়ে নিলাম। তারপর কিছুক্ষণ খোলা বারান্দায় পায়চারি করে ফিরতে লাগলাম। এইভাবে অনেকক্ষণ কেটে গেলো। এরপর একসময় বিছানার বুকে আশ্রয় নিলাম। কতক্ষণ পরে জানিনা, দেখলাম······

······পরম রমণীয় এক পুষ্পোদ্যানের মধ্যে আমি ইতস্তত বিচরণ করছি। চারিদিকে কত জানা-অজানা প্রস্ফুটিত পুষ্পের সমারোহ। পুষ্পনিচয়ের সৌগন্ধে চারিদিক আমোদিত। আকাশ হতে জ্যোৎস্নার কিরণ-সুধা বর্ষিত হচ্ছে। আমি ইতস্তত ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ এক করুণ বিলাপ শুনতে পেলাম। প্রথমে মনে হ'ল এ বুঝি বিলাপ নয়, সঙ্গীত। কিন্তু কান পেতে অনেকক্ষণ ধরে বিশেষ মনোযোগের সহিত শুনে উপলব্ধি করতে পারলাম যে, এ সঙ্গীত নয়, নারী কণ্ঠের করুণ বিলাপ। কেমন যেন মোহাবিষ্টের মত আমি সেই ক্রন্দন লক্ষ করে এগিয়ে চললাম। অনেকক্ষণ ধরে চলে আমি আরও রমণীয় এক স্থানে আগমন করলাম। দেখলাম সম্মুখস্থ সরোবরের কমল-বনে এক অপরূপ লাবণ্যবতী দেবীমূর্ত্তি পদ্মাসনে উপবিষ্টা। তাঁর হস্তধৃত বীণা হতে এক অতি করুণ সুর নির্গত হচ্ছে যা কান্নারই নামান্তর। দেবী বিশেষ বিচলিতা। মনের মাঝে যেন তাঁর ব্যথার ঝড় বইছে। তাই তাঁর চোখেমুখে এক অস্থিরতার ছাপ। আমি অতীব শঙ্কাতুর পায়ে ধীরে ধীরে দেবীর কাছে গিয়ে জোড় করে প্রণিপাত করে শুধালাম:

—দেবি! কি হেতু আপনি আজ এত উতলা? আর আপনার

করকমলধৃত বীণা হ'তেই বা কেন এমন করুণ স্বর নির্গত হচ্ছে ?

দেবী তাঁর অপূর্ব্ব রূপমাধুরীমা বিজড়িত বক্ষলগ্ন কমলানন উত্তোলন পূর্ব্বক বীণানিন্দিত কণ্ঠে বললেন :

—বৎস, আমি আজ বিশেষ বিচলিতা, কারণ আমার এক বরপুত্র নিজের সারাজীবনের সাধনায় যা অর্জ্জন করেছিল, মুহূর্ত্তের ভুলে তার সব কিছু হারিয়ে বিশেষ মনস্তাপের মধ্যে দিনাতিপাত করছে।

—দেবি ! আপনি অলৌকিক ক্ষমতাশালিনী। আপনি কি বাসনা করলেই আপনার বরপুত্রের মনস্তাপ লাঘব করে তাকে স্বাভাবিক সুখৈশ্বর্য্য ফিরিয়ে দিতে পারেন না ?

—বৎস, এখানেই তোমরা ভুল কর, তোমাদের ধারণা দেবদেবীবৃন্দ ইচ্ছা করলেই যা খুশী করতে পারেন। কিন্তু বৎস, বাস্তবে তা হয় না। দেবদেবীরাও নিয়তির বিধি লঙ্ঘন করতে পারেন না। আমার ক্ষমতা থাকলে আমি এই মুহূর্ত্তে আমার প্রিয়তম শিষ্যকে সকল সন্তাপের হাত থেকে রক্ষা করতাম। কিন্তু তা হবার নয়।

—দেবি ! একটি বিষয়ে আমার মনে প্রবল কৌতূহল জাগরূক হয়েছে ; অনুগ্রহ করে তা খণ্ডন করবেন কি ?

—বল বৎস, সাধ্যমত চেষ্টা করব।

—আপনার বরপুত্রের মনস্তাপের কারণ কি ?

—কারণ আর কিছুই নয়, সে তার একান্ত ভালবাসার পাত্রী, জীবন-নায়িকাকে হারিয়ে তার বিরহ সইতে পারছে না।

আবার আমি প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলাম—তার নায়িকার মৃত্যুর কারণ কি ? কিন্তু হঠাৎ প্রবল মারুত হিল্লোলে বনের বৃক্ষরাজি

আন্দোলিত হ'তে লাগল। আকাশে ঘন ঘন চমকাতে লাগল বিদ্যুৎ। আর গুরু গুরু শব্দে মেঘ ডাকতে লাগল।......

আমার কক্ষের কড়া নাড়ার কড় কড় শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল। চোখ রগড়ে বিছানায় উঠে বসলাম। বাইরের প্রকৃতি তখন তরুণ অরুণের সুবিমল কিরণ-স্নাত। মনে ভাবলাম এতক্ষণ তবে স্বপ্ন দেখছিলাম! দরজা খুলেই দেখলাম, দাঁড়িয়ে আছেন শার্ঙ্গদেব। বিস্ময়কণ্ঠে বললাম ঃ

—আপনি ?

—হাঁ বাবুজী, বেলা অনেকটাই হল। প্রভাতী খাবার জুড়িয়ে যাচ্ছে। তাই আপনার ঘুম ভাঙ্গালাম। আপনি মুখ হাত ধুয়ে নিন। তা ছাড়া আপনাকে এখন আমার কাহিনী শুনাব।

কথা শেষ করেই শার্ঙ্গদেব চলে গেলেন। আমি কালবিলম্ব না করে বাথরুমে গিয়ে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করে এলাম।

কক্ষে ফিরে এসেই দেখলাম প্রাতরাশ নিয়ে অপেক্ষা করছে লছমী। শার্ঙ্গদেবের কাহিনী শোনার প্রচণ্ড কৌতূহলে যত দ্রুত সম্ভব হাত চালিয়ে খাওয়ার পাট চুকিয়ে ফেললাম। খাওয়া শেষ হতে না হতেই কৈলাশ এসে বলল ঃ

—আইয়ে বাবুজী!

কৈলাশকে অনুসরণ করে অন্দরের পথে দ্বিতলের সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলাম। কালকের দেখা চার-পাঁচটি তালাবদ্ধ ঘরের একটি খোলা ছিল। তাতে ঢুকলাম—দরজায় ঝুলানো দামী পর্দা সরিয়ে। ঘরে ঢুকেই দেখলাম আধুনিক ধরণের ফার্ণিচার দিয়ে ঘরখানা বেশ রুচিসম্মতভাবে সাজানো। একদিকে একটি সোফা সেট, তারই অদূরে পালঙ্ক, এককোণেএকটা রাইটিং টেবল। ঘরের ডিষ্টেম্পার করা দেয়ালে অনেকগুলি ফটো। প্রায় সবগুলি ফটোই 'দেবীজী'র। একটিতে কেবল বরবেশে শার্ঙ্গদেব আর বধূবেশে মালবিকা হাস্যোজ্জ্বল ভঙ্গিতে চেয়ে আছেন। দেবীজীর যতগুলি ফটো কক্ষে স্থান পেয়েছে, তার এক একটিতে তিনি এক এক রূপে বিরাজিতা। কোনটায় দেবযানী, কোনটায় সীতা, কোনটায় শ্যামা, কোনটায় বা হাস্যবিধুরা নর্ত্তকী। আমি বিশেষ আগ্রহীদৃষ্টিতে ফটোগুলি দেখছিলাম, এমন সময় পর্দা সরিয়ে ঘরে এলেন শার্ঙ্গদেব। তিনি একটা সোফায় উপবেশন করে আমায় আহ্বান জানালেন। আমি তাঁর সম্মুখের সোফাটায় বসলাম। শার্ঙ্গদেব গভীরকণ্ঠে বললেন :

—বাবুজী, যদি অনুমতি দেন, তবে এবার সুরু করি এ হতভাগ্যের কাহিনী।……

—সুরু করুন ওস্তাদজী, আমি শুনতে বিশেষ উদগ্রীব।

আমার কথার পরই শার্ঙ্গদেব বলতে থাকেন :

—বাবুজী, সে হবে আজ থেকে পাঁচ বছর আগের কথা। সে বছর মহাধুমধামের সঙ্গে কলকাতায় নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলনের আয়োজন চলেছে। সেবারই আমি সর্বপ্রথম সাধারণের সম্মুখে সঙ্গীত

পরিবেশনের আদেশ পেয়েছি গুরুজীর কাছ থেকে। বেনারস বা লখনউয়ে সঙ্গীত সাধকের অভাব নেই। কিন্তু আমি যাঁকে গুরু হিসেবে গ্রহণ করেছিলাম তিনি তেমন নামী লোক ছিলেন না। আমি যতটুকু জানি, তিনি ছিলেন একজন সিদ্ধ পুরুষ। বাবুজী, তিনি ছিলেন কিন্তু আপনাদের বাঙ্গালী। তবে জীবনের প্রায় সবটাই তিনি আমাদের এই তীর্থভূমি বেনারসে কাটান। নাম তাঁর বলবন্ত ঠাকুর। তাঁকেই সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করতে আহ্বান জানিয়েছিলেন কলকাতা থেকে, সম্মেলনের কর্ত্তৃপক্ষ। কিন্তু তিনি জনকোলাহল বরাবরই এড়িয়ে চলতেন। তাই শেষ পর্য্যন্ত শিষ্যদের ভেতরে আমাকে নির্বাচিত করে কলকাতায় গাইতে পাঠালেন।

সেই প্রথম সাধারণ্যে গাইতে যাচ্ছি—এ জন্য মনে আমার আনন্দ হয়েছিল যত, দ্বিধা হয়েছিল তার চেয়ে বেশী। কীইবা শিখেছি এতদিনে—এখনও অনেক রাগ-রাগিনীর পরিশীলনই যে বাকী রয়েছে। মনে উৎকণ্ঠা, যদি গুরুজীর মুখ রক্ষা করে ফিরে আসতে না পারি? শত দ্বিধা সত্বেও গুরুজীর আদেশ শিরোধার্য্য করে এক সন্ধ্যায় কলকাতা অভিমুখে রওনা হলাম।

প্রথম দিনেই আমার প্রোগ্রাম ছিল। সন্ধ্যা থেকে অধিবেশন স্নুরু। যথাসময়ে আমি উদ্যোক্তাদের গাড়ীতে করে হলে গিয়ে পৌঁছালাম। আসরের সামনা সামনিই আমার আসন নির্দ্দিষ্ট ছিল। আসনটি অধিকার করে বসে হলের চারদিকে দৃষ্টি বুলিয়ে দেখলাম কোন আসনই প্রায় খালি নেই। মনে মনে ভাবলাম এত লোকের সামনে যদি স্নুরলক্ষ্মীর আরাধনায় বিফলকাম হই তবে সে লজ্জা রাখবার স্থান থাকবে না। মনের বল অটুট রাখবার জন্য বারবার গুরুজীর নাম স্মরণ করতে লাগলাম আমি।

সঙ্গীত সম্মেলনে সাধারণতঃ সাধারণ শ্রেণীর শিল্পীদের প্রোগ্রামই থাকে প্রথম দিকে। আমিও তখন সাধারণ ত বটেই তার নীচেও যদি কোন শ্রেণী থাকত তার পর্য্যায়েই পড়ি। তথাপি কেন জানি না উদ্যোক্তারা আমার নাম প্রথম অধিবেশনের তালিকার সঙ্গীত শিল্পীদের মধ্যে পঞ্চম স্থানে ফেলেছিলেন।

বন্দেমাতরম্ সঙ্গীত ও বক্তৃতাদির পর প্রোগ্রাম সুরু হবে নৃত্য দিয়ে। এই নৃত্যশিল্পী সম্পর্কে অডিটরিয়ামে সামনের দিকে উপবিষ্ট অভিজাতদের মধ্যে বেশ কাণাঘুষা শুনছিলাম। আগে নাকি এরূপ সম্মেলনে কোন আভিজাত বংশীয় নৃত্যশিল্পী অংশ গ্রহণ করেনি। আমি অবশ্য কলকাতার সঙ্গীত সম্মেলন সম্পর্কে কোন সংবাদই ইতিপূর্বে রাখিনি। তাই এ বিষয়ে বেশী মাথা ঘামালাম না। তাছাড়া আমি তখন নিজের ধান্দায় নিজে অত্যন্ত ব্যস্ত। তখন থেকেই আমি বিভিন্ন রাগ-রাগিনীর রূপ কল্পনা করে কোনটা ভালভাবে রেওয়াজ করে অধীত হয়েছে তা নিরূপণে ব্যস্ত।

যথাসময়ে সম্মেলন সুরু হল। প্রথমে বন্দেমাতরম্ সঙ্গীত ও তারপর বক্তৃতার পালা শেষ হতেই মঞ্চের যবনিকা পড়ল। আমি যত চেষ্টা করছি আত্মগত হ'য়ে রাগ-চিন্তায় নিজেকে ডুবিয়ে দিতে ততই চারদিকের আসনগুলো থেকে আসন্ন নৃত্য সংক্রান্ত আলোচনা ভেসে এসে আমার মনোযোগ নষ্ট করছে। এ জন্য আমি মনে মনে যে বিরক্ত হচ্ছিলাম তা বলাই বাহুল্য। আরও কয়েক মিনিট কেটে যাবার পর আমার পাশের দু'টি খালি আসনের একটিতে এক সৌম্যদর্শন প্রৌঢ় ভদ্রলোক এসে বসলেন। তাঁর চোখে মুখেও বিশেষ উৎকণ্ঠার ছাপ লক্ষ্য করলাম। তিনিও মনের সমগ্র একাগ্রতায় যবনিকার দিকে চেয়ে বসে রইলেন।

আরও কিছুক্ষণ কেটে যাবার পর বেল পেটার শব্দ হতেই যবনিকা অপসারিত হল। সঙ্গে সঙ্গে হলের সহস্র দর্শকের সবার দৃষ্টিতে একই সঙ্গে লাগলো বিমুগ্ধতার অঞ্জন। আমিও অবশ্য তাদের মধ্যে একজন। বিস্ময়বিস্ফারিত দৃষ্টিতে দেখলাম মঞ্চের উপরে নৃত্যের ভঙ্গিতে যেন কোন দেবকন্যা আবির্ভূতা হয়েছেন! ঠোঁটের কোণে তার মিষ্টি-মধুর এমন এক অনন্য হাসি যা মোনালিসার হাসিকেও ব্যাঙ্গ করবার স্পর্দ্ধা রাখে। কি বলব বাবুজী, আমার মনে হল কোন সুপটু স্থপতি যেন তার সারাজীবনের সাধনায় অতি যত্নে মনের সকল মাধুরী মিশিয়ে শ্বেতপ্রস্তর নির্মিত এই মানবী-মূর্ত্তি গড়ে তুলেছেন। গলদেশে তার শ্বেত রজনীগন্ধার আজানুলম্বিত মালিকা, বিচিত্র আভরণে ভূষিতা সে, পরিধানে শ্বেতবাস, বেণীবদ্ধ কেশদাম, কমলনিন্দিত আনন, আয়তনেত্রা, উন্নত নাসা, নাসিকাগ্র মৃদু মৃদু স্ফুরিত, চন্দনচর্চিত ভাল, সুচিক্কন ওষ্ঠাধর, উন্নত বক্ষে অরুণ-বর্ণের কাঁচুলি, বাহুতে শ্বেতপুষ্প নির্মিত বলয়, আজানুলম্বিত সর্পসদৃশ বেণীতে স্বর্ণ বর্ণের জরির ফিতা জড়ান। এমন মোহময় ভঙ্গিতে ইতিপূর্ব্বে কোন নর্ত্তকী জগতের কোন মঞ্চে দাঁড়িয়েছিল কিনা সে বিষয়ে আমার মনে গভীর সংশয় জাগল।

মিনিটখানেক সেই অপরূপ মূর্ত্তি মঞ্চোপরি অচঞ্চল রইলো। তারপর বাদ্যযন্ত্রাদিতে উঠল সুর, তবলায় উঠল বোল, সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য-ঝঙ্কারে ছন্দায়িত হয়ে উঠল সে বরতনু। শিল্পী তন্ময়তার অতলে অবগাহন করে মুদ্রা থেকে মুদ্রান্তরে ছন্দবদ্ধ ভঙ্গিতে নেচে চললেন। দর্শকবৃন্দ মুহুর্মুহু করতালি দিয়ে অভিনন্দন জানাতে লাগল এমন অপ্সরানিন্দিত নৃত্যশিল্পীকে।

বাবুজী, নাচ ইতিপূর্ব্বে বহুবার দেখেছি—জানেন ত, আমাদের

দেশে বিয়ে-শাদিতে বাঈজীদের নাচ-গানের আয়োজন করাটা চিরন্তন প্রথা। বিশেষ করে জমিদার ও 'রইস' মহলের বহু বিবাহ বাসরে তাদের সুন্দর নৃত্য দেখা বা সঙ্গীত শোনার পূর্বঅভিজ্ঞতা আমার ছিল। কিন্তু আজ যে স্বর্গীয় নৃত্য দেখলাম, এর তুলনা আমি আমার পঁচিশটি বসন্ত অতিক্রান্ত জীবনে সঞ্চয় করতে পারিনি।

সত্যি বল্‌তে কি, যতক্ষণ সেই অপূর্ব নাচ চলল ততক্ষণ আমি সেই অনুপম লাবণ্যময়ীর উপর থেকে মুহূর্ত্তের জন্যও দৃষ্টি ফেরাতে পারিনি। হঠাৎ এক সময় নর্ত্তকীর দৃষ্টি আমার নয়নে পতিত হলে—ঠিক যেন এক বিদ্যুৎ প্রবাহ বয়ে গেল আমার অনুভূতির তন্ত্রে তন্ত্রে। ওদিকে নর্ত্তকীরও সেই অবস্থা হ'য়েছিল কিনা জানি না, সেও কিছুতেই তার দৃষ্টি আমার নয়নচ্যুত করতে পারছিল না। এদিকে তার নৃত্যে ছন্দপতন হতে যায়! তবলচি বার বার তার দিকে চেয়ে তার সম্বিত ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট। কিন্তু কিছুতেই যে তার দৃষ্টির তন্ময়তা কাটে না! আমি হঠাৎ বিবেকের কষাঘাতে মনকে সচেতন করতে চেয়ে বললাম—এখনই সর্বনাশ হবে, নৃত্যের ছন্দপতন ঘটলে সহস্র দর্শকের কাছে নিন্দিত হবে ঐ অনন্যা নর্ত্তকী। মুহূর্ত্তকাল মধ্যে আমি আমার দৃষ্টি আনত করে নর্ত্তকীর পদযুগলে নিবদ্ধ করলাম। দেখলাম, আবার যথানির্দিষ্ট ছন্দে লীলায়িত হয়ে উঠেছে তার রাজীব চরণযুগল!

নমস্কারের ভঙ্গিতে শিল্পী যখন তাঁর স্বর্গীয় নৃত্যে ছেদ টানল, তখন দীর্ঘস্থায়ী করতালিতে দর্শককুল মেতে উঠেছে। আমার মনের অবস্থা তখন বর্ণনাতীত—একবার ইচ্ছে হল, ছুটে যেয়ে মনের সবটুকু শ্রদ্ধা জানিয়ে আসি, আবার মনে হল আমার মত তরুণ সঙ্গীত শিল্পীর অভিনন্দনের কতটুকু মূল্য দেবে সে? আমার পাশে বসা

প্রৌঢ় ভদ্রলোক নাচ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই উঠে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পর মাইকে ঘোষণা করা হল যে, বিভিন্ন দর্শকের পক্ষ থেকে নৃত্যশিল্পী মালবিকা দেবীকে আটটি স্বর্ণপদক উপহার দেবার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে!

কয়েক মিনিট পর আমি হলের প্রবেশ পথের দিকে দৃষ্টি ফেলে সবিস্ময়ে দেখলাম যে সেই প্রৌঢ় ভদ্রলোককে অনুসরণ করে বহুর দৃষ্টিবাঞ্ছিত মালবিকা দেবী এই দিকেই আসছেন। তাঁর আগমনে সারা হলে অদ্ভুত চাঞ্চল্য পড়ে গেল। আমার মনেও সে চঞ্চলতার স্পর্শ লাগল।

আশ্চর্য্য দৃষ্টিতে দেখলাম এগিয়ে এসে ঠিক আমার পাশের আসনটিই অধিকার ক'রে বসলেন মালবিকা দেবী। আমি নিজেকে কৃতার্থ মনে করলাম। বসেই দু'তিনবার আমার দিকে অপাঙ্গে চাইলেন। কি এক লজ্জায় আমি আকর্ণ লাল হয়ে উঠলাম। সারা দেহের সবটুকু রক্ত ছুটে এসে আমার সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ল। অবশেষে সব লজ্জার মাথা খেয়ে আমার কোটের 'বাটন-হোলের' শ্বেতশুভ্র গোলাপ ফুলটা খুলে সেই অনন্যার দিকে বাড়িয়ে ধরে কম্পিতস্বরে বললাম ঃ

—ইফ ইউ প্লিজ, মে আই অফার ইউ দিস লিটল ফ্লাওয়ার?

—ওঃ, থ্যাঙ্কস্! মেনি থ্যাঙ্কস!

বলতে বলতে আমার হাত থেকে ফুলটা একরকম ছিনিয়ে নিলেন তিনি। আমাদের উভয়ের অঙ্গুলি পরস্পর স্পর্শিত হল। আমার দেহে আবার এক মৃদু রোমাঞ্চিত শিহরণ জাগল!

কিছুক্ষণ পরই সঙ্গীতের আসর সুরু হল। আমার আগে যে ক'জন আসরে বসে সঙ্গীত পরিবেশন করলেন, তাঁরাও তরুণ। তাঁদের

কেউই তেমন জমাতে পারলেন না। অবশেষে এলো আমার পালা। আমি আসন ছেড়ে গাত্রোত্থান করে অডিটরিয়ামের বাইরে এসে মঞ্চের দিকে এগিয়ে চললাম। মঞ্চের মুখে তখন যবনিকা। আমি আসরে আসন গ্রহণ করে আমার তানপুরার সঙ্গে কণ্ঠের স্বর মিলিয়ে নিলাম। ডানদিকে বসলেন সারেঙ্গী বাদক, বামে তবলচি। মনে মনে ভেবে ঠিক করে নিলাম 'তোড়ী' রাগিনীতে খেয়াল গাইব। মুদ্রিত নয়নে গুরুজীর ধ্যান করে নিলাম। মানসে ভেসে উঠলো সেই দিনটির কথা, যেদিন তিনি 'তোড়ী'র রূপ বর্ণনা ক'রে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন আমাদের ঃ

—তোড়ী রাগিনী অনিন্দ্য রূপযৌবনসম্পন্না, সে নায়কের অতীব প্রিয়তমা। তার পরিধানে শ্বেতবস্ত্র, বক্ষে নিরুপম কাঁচুলি। সে বিচিত্র অলংকারে শোভিতা। কর্পূরমিশ্রিত সুবাসিত তৈলসিক্ত তার কেশরাশী। সে কুসুম কাননে একাকী উপবেশন ক'রে বীণা বাজাচ্ছে।

ধ্যান শেষ করে যবনিকা উত্তোলন করতে ইঙ্গিত করলাম। আমার দৃষ্টি প্রথমেই ঠিকরে পড়ল মালবিকা দেবীর উপরে। দেখলাম, আমাকে গায়কের আসনে দেখেই সম্ভবতঃ তাঁর মুখে চোখে বিপুল বিস্ময়ের ছাপ। তথাপি আমার দৃষ্টির বিনিময়ে তিনি তাঁর অপূর্ব শুচিস্নিগ্ধ হাসি উপহার দিলেন।

আমি স্তিমিত নেত্রে বিভোর ভঙ্গিতে সুরালাপ সুরু করলাম। তারপর কয়েক মিনিটের মধ্যেই যেন আমার কণ্ঠাসনে সুরলক্ষ্মীর আবির্ভাব অনুভব করলাম। আলাপের পরে আলাপে শ্রোতা সাধারণকে বিমুগ্ধ করতে যে সেদিন সক্ষম হয়েছিলাম তা তাদের ঘন ঘন করতালি শুনেই বুঝতে পরলাম। তাদের উৎসাহ পেয়ে

আমি আরও নিবিষ্ট হয়ে রাগ বিস্তারে মনোনিবেশ করলাম। আমার গাওয়া যখন শেষ হ'ল তখন সারা হলে করতালির বন্যা প্রবাহিত। আমি আসর থেকে উঠতে উঠতে শুনলাম আমার গানে খুশী হ'য়ে কয়েকটি পদকদানের প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করা হচ্ছে। অপার আনন্দে আমার মন প্রাণ উতল হয়ে উঠল। কিন্তু তখনও আমি জানতাম না, আরও এক অতি দুর্লভ উপহার আমার ভাগ্যে অপেক্ষা করছে। ষ্টেজ থেকে নেমে বাইরে আসতেই মনে হ'ল এক ঝলক স্বর্গীয় আলো যেন দ্রুত এগিয়ে আসছে আমার দিকে। বিস্ময়বিস্ফারিত চোখে চেয়ে দেখলাম সারা মুখে পরিপূর্ণ হাসি মেখে শ্বেত রজনীগন্ধার মালা হাতে মঞ্চ থেকে বেরুবার মুখেই এসে থমকে গেলেন শ্বেতাম্বরা এক বরনারী। আমাকে দেখা মাত্রই চঞ্চল চরণে এগিয়ে এসে হস্তধৃত মালাটা আমারই গলায় পরিয়ে দিলেন সেই লাবণ্যময়ী নর্ত্তকী। শিল্পীর প্রতি শিল্পীর এ শ্রদ্ধা নিবেদনে অনুরাগীরা হাততালি দিয়ে উঠল। কিন্তু আমার মনে হল এ শুধুমাত্র শিল্পীর প্রতি শিল্পীর শ্রদ্ধা জানানই নয়, সেই সংগে যেন আরও কিছু। সেই কিছুর কথা ভেবে আমার হৃদয়-মন মেঘ দেখা ময়ুরের মত নেচে উঠল।

এযে আমার পক্ষে একেবারেই অকল্পিত উপহার! একটা অনাস্বাদিতপূর্ব আনন্দে আমার অন্তরলোক আকুল হল। বললাম ঃ

—এমন সৌভাগ্য লাভের যোগ্যতা কি আমার আছে? আমি কি তেমন কোন গুণী?

—সে কি! আপনি বাংলা জানেন?

বিস্মিতস্বরে বলেন মালবিকা।

—বাংলা জানবনা কেন, আমার গানের গুরুজী স্বয়ং বাঙ্গালী।

তা'ছাড়া আমি বাংলা নিয়ে বি, এ পাশ করেছি, এম এ. পরীক্ষার সময় আমার বাঙ্গালী গার্ডিয়ান টিউটরের কাছে কলকাতা ইউনিভার্সিটির এম এ কোর্সের সব বাংলা বই পড়েছি।

—তবে ত ভালই হ'ল !

উৎফুল্ল হয়ে বলতে থাকে মালবিকা।

—একটা অনুরোধ করব, বলুন রাখবেন ?

অপূর্ব্ব ভংগিতে অনুনয়ের স্বরে বলল নর্ত্তকী। শুধু আমি কেন, যে কোন লোক হলেই তার অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারত না। বললাম ঃ

—বলুন, অসাধ্য না হলে নিশ্চয়ই রাখবো।

—অসাধ্য কেন হবে, অনিচ্ছা না হলেই এ অনুরোধ রাখতে পারেন।

—তবে বলুন।

—যে ক'দিন এখানে মানে এই কলকাতায় থাকবেন, আমাদের বাড়িতে অতিথি হতে হবে।

—এ ত আমার পরম সৌভাগ্য ! কিন্তু আপনাদের মিছিমিছি বিব্রত করাটা কি উচিত হবে ?

—খুব হবে, চলুন ত ?

—কিন্তু আমার জিনিষপত্র ?

—সে ব্যবস্থা আমি দেখছি।

ইতিমধ্যে সেই প্রৌঢ় ভদ্রলোক অডিটরিয়াম থেকে বেরিয়ে আসতেই মালবিকা ছুটে যেয়ে তাঁকে একান্তে টেনে নিয়ে কি যেন অনুচ্চ স্বরে বলল। তারপর আমার দিকে এগিয়ে এসে বলে :

—আমার বাবা।

আমি নমস্কার করলাম। ভদ্রলোক প্রতিনমস্কার করে আমার দিকে চেয়ে বললেন ঃ

—আপনার জিনিষপত্র আমরা যাবার পথেই নিয়ে যাব'খন!

পরদিন প্রভাতে নিদ্রিত আমি কি এক মধুর স্বপ্ন দেখছিলাম। এমন সময় দরজার কড়া নাড়ার শব্দ কানে আসতেই সুখ-স্বপ্ন টুটে গেল। সেই সংগে নিদ্রাও।

আমার বাড়ীর কোন নবনিযুক্ত দাস বা দাসী এমন গর্হিত কাজ করেছে ভেবে একটা হেস্তনেস্ত করার ইচ্ছায় বিছানা থেকে উঠে দরজা খুলে দিলাম। কিন্তু সম্মুখবর্ত্তিনীর উদ্দেশ্যে কোন তিক্ত বিশেষণ সম্বলিত গালমন্দ মুখ দিয়ে কিছু বেরুলো না। তার পরিবর্তে মুগ্ধ, বিস্মিত আমার মুখ দিয়ে একটি মাত্র অস্ফুট কথা বেরুল ঃ

—সুন্দর !

দোরগোড়ায় তখন সদ্যস্নাতা আলুলায়িতকুন্তলা ,রক্তাম্বরা মালবিকা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মৃদু মৃদু হাসছিল।

—শুনেছি ভোরে ঘুম ভাঙ্গালে গায়কদের মেজাজ বিগড়ে যায়। ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিলাম, কৈ গাল দিলেন না আমায় ?

হাসি মাখা স্বরে বলে মালবিকা।

—গাল ? না গাল দেব না ; তার চেয়ে দু'কলি গানই দিচ্ছি উপহার ঃ

বলে আমি চাপা স্বরে গেয়ে উঠলাম ঃ

প্রভাতে-য়ে উঠিয়া
ও মুখ হেরিনু-উ-উ
দিন যাবে আজি-ই ভা-য়া-লো।

—কি যে বলেন ?

বলে অধরোষ্ঠে সরমের ছোঁওয়া লাগিয়ে ত্বরিৎপদে অদৃশ্য

হ'য়ে গেল মালবিকা। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই আবার উপস্থিত হ'ল—ডান ও বাঁ হাতে দু'জন যুবতী মেয়ের কাঁধ ধরাধরি করে। ওদের নিয়ে আমার কক্ষের দরজায় দাঁড়িয়ে বলল :

—আপনার সঙ্গে আমার দু'জন শত্রুর পরিচয় করিয়ে দিই।

বলে বাঁ দিকের তরুণীর দিকে আয়ত চোখে ইঙ্গিত করে আবার বলল :

—এই ইনি—এঁর নাম অনসূয়া।

আর ডান দিকের তরুণীর দিকে আগের মত ইংঙ্গিত করে বলল :

—এঁর নাম হল প্রিয়ংবদা।

আমি ওঁদের প্রতি যুক্ত কর তুলে পরপর নমস্কার করলাম। তারপর হাসতে হাসতে বললাম :

—অতিথির সংগে শত্রুদের পরিচয় করিয়ে দেবার রেওয়াজ এই বাংলার রাজধানী কলকাতা সহরে আছে বলে কিন্তু আমি জানতাম না।

—কি, কেমন জব্দ সখী ?

অনসূয়া আমার কথা শুনে মালবিকার দিকে চেয়ে কৌতুক-কণ্ঠে বলে।

—শত্রুদের না হয় পরিচয় করে দিলে সখী, কিন্তু দুষ্মন্তকে এই প্রভাতকালে পাদ্য-অর্ঘ্য না দিয়ে বসিয়ে রাখাটা কি ঠিক হবে ?

বলল প্রিয়ংবদা। তদুত্তরে মালবিকা 'ধ্যেৎ' বলে এক ছুটে পালিয়ে গেল। ও পালিয়ে বাঁচলো বটে, কিন্তু আমার প্রতি নব-বিশেষণে আমি এই যুবতীদ্বয়ের সম্মুখে যাকে বলে আরক্ত হয়ে আনত মুখে দাঁড়িয়ে রইলাম।

কিন্তু একসময় মুখ তুলে দেখলাম তারা অদৃশ্য হয়েছে। নিজেকে একান্তে পেয়ে দুষ্মন্ত-শকুন্তলা উপাখ্যান মনে মনে নাড়াচাড়া করতে লাগলাম। কিন্তু দুষ্মন্তের অভিজ্ঞান-অঙ্গুরীয় বিস্মরণের প্রসংগ মনে হতেই ভাবলাম—না, অমন করে নিজেকে ভাবতে পারব না।

কতক্ষণ বসে বসে এইসব ভেবেছিলুম জানি না। একসময় তকমা আঁটা বেয়ারা এসে আমায় প্রাতঃকৃত্য সারতে বাথরুমে যেতে আহ্বান জানাল।

বাথরুম থেকে ফিরে এসে শ্লিপিংস্যুট ছেড়ে ধুতি পাঞ্জাবী পরে নিলাম।

কিছুক্ষণ পরই বেয়ারা এসে প্রাতরাশের জন্য আহ্বান জানাল। তাকে অনুসরণ করে খাবার ঘরে ঢুকতে যেতেই মালবিকার বাবা আমায় স্বাগত জানিয়ে বললেন ঃ

—আসুন !

আমি একটি অনধিকৃত আসনে উপবেশন করতে করতে কুণ্ঠিত-স্বরে বললাম ঃ

—আপনি আমায় আপনি বললে বড় লজ্জা পাই।

—বেশ ত এবার থেকে না হয় তোমায় 'তুমি' বলেই ডাকব ইয়ংম্যান। আমার কি জান, এই এত ভোরে ঘুম ভাঙ্গে না, কিন্তু পাগলী মেয়ের হাত থেকে কি নিস্তার আছে। সাত সকালে ডেকে তুলে বেটি বলে কিনা—আজ সবাই একসঙ্গে ব্রেকফাষ্ট করবো। আচ্ছা, তুমিই বল ত, আমার এই বুড়ো বয়েসে কি অত ঝক্কি-ঝামেলা সহ্য হয় ?

—কিছু মনে না করলে বলি, আপনি কিন্তু এমন কিছু বুড়িয়ে যান নি।

কুণ্ঠিতস্বরে বললাম। মালবিকা সঙ্গে সঙ্গে হাসি-উচ্ছ্বলকণ্ঠে বলে ওঠে :

—কেমন জব্দ বাপি, আমি যে এত করে বলি, তোমার এমন একটা কিছু বয়েস হয়নি—তা কিছুতেই বিশ্বাস করো না। এবার শুনলে ত থার্ড পার্সন-এর ভিউ কি ?

—তোরা, মানে অল্পবয়েসীরা সবাই সমান, সবাই এক সুরে কথা কইবি। কিন্তু আমার বয়েসটা কত হল তা জানিস, এ বছর জানুয়ারীতে ফিফটি পেরিয়ে ফিফটি ওয়ান-এ পড়লাম। বাঙ্গালীর এ্যাভারেজ আয়ু হল মাত্র পঁচিশ বছর, সেখানে আমি পঞ্চাশ বছর বয়েসেও বুড়ো হলুম না ? আরে চুলে কলপ দিলেই কি বয়েস কমে যায় ?

দুহাতে দুটো প্লেট নিয়ে কক্ষে প্রবেশ করতে করতে অনসূয়া বলল :

—না জ্যাঠামণি, ওরা যাই বলুক, আপনার বয়েস হয়েছে বৈকি ? বলে সে মালবিকার দিকে চেয়ে কটাক্ষ হানলো।

প্রাতরাশ হলেও আয়োজন ছিল প্রায় পূর্ণরাশের মতই। অনেকক্ষণ ধরে গল্প-গুজবের মধ্যে আহারপর্ব চলল। ইত্যবসরে মালবিকার বাবা মিঃ রায় আমার সম্পর্কে অনেক কিছুই জেনে নিলেন।

—বেনারসের কোন দিকটায় তোমাদের বাড়ী ?

—মাহ্মুরগঞ্জ-এ। ওখানেই জমিদার ও রইসদের বাস। আমাদের দেশে অভিজাতদের রইস বলে।

—বাড়ীতে তোমার কে কে আছেন ?

—নিজের বলতে কেউ নেই। বাবা গত হয়েছেন, আমি যখন

ফার্ষ্ট ইয়ারে পড়ি। মাকে হারিয়েছি ত নিতান্ত শৈশবেই। আমিই বংশের একমাত্র সন্তান। বাবাও ছিলেন একমাত্র সন্তান। নিকট আত্মীয় আমার কেউ নেই। আপনজন বলতে আমাদের মুনিমজী আছেন—তিনিও বৃদ্ধ হয়েছেন। তবে তিনিই স্নেহ দিয়ে, অভিভাবকত্ব দিয়ে আমায় মানুষ করে তুলেছেন। এ ছাড়া হিন্দু ইউনিভার্সিটির প্রফেসর দে আমার গার্ডিয়ান টিউটর ছিলেন ছোটবেলা থেকে। আমার এ্যাকাডেমিক কেরিয়ারের জন্য আমি তাঁর কাছে বিশেষ ঋণী।

—তোমার গানের গুরু কে ?

—আমার গানের গুরুজীও বাঙ্গালী। নাম কলবন্ত ঠাকুর। তাঁর নাম বেশী প্রচার না হলেও তিনি সঙ্গীতে ও সাধন-ভজনে সাধকপুরুষ। একেবারে সিদ্ধ পুরুষের মত দিন গুজরাণ। জাগতিক সুখ সম্পদের প্রতি কোন আকর্ষণ নেই তাঁর। সাধন ভজন করে পরমার্থিক চিন্তায়ই দিনাতিপাত করেন। তিনি বলেন, সঙ্গীতাধ্যয়ন করেছি মনের নিবিষ্টতায় সেই পরম পুরুষের কাছে পৌঁছাবার দরুণ। কতদিন দেখেছি ডিসেম্বরের হাড়-কাঁপানো শীতেও পালা-পার্ব্বণ পড়লে মধ্য রাত্রিতে গঙ্গাস্নান করে আসেন। কতদিন আমরা রেওয়াজ করতে যেয়ে তাঁকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ধ্যাননিবিষ্ট দেখে ফিরে এসেছি।

—বাপি, ওঁকে বড্ড বেশী কথা বলাচ্ছো, দেখছ না, সব খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে !

অনুযোগ করে মালবিকা।

—ওঃ—হো—হো ! তাই ত রে-মা—আমার সেদিকে খেয়ালই ছিল না।

—না—না ; আমি ঠাণ্ডা খেতেই ভালবাসি।

বলে আমি মিঃ রায়ের অপ্রস্তুতের ভাবটা কাটাবার সুযোগ করে দিই। খাওয়ার প্রায় শেষাশেষি মালবিকা বলে :

—বাপি, মিঃ চৌধুরী এই প্রথম কলকাতায় এসেছেন—ওঁকে ত সবকিছু দেখাতে হবে আমাদের—কবে, কোথায় যাওয়া হবে একটা প্রোগ্রাম চক-আউট করে ফেললে হত না?

—ওর মাঝে আর তোর এই বুড়ো ছেলেকে জড়াসনে মা—তুই আছিস, তোর দুই শত্রু রয়েছে ; তিনজনে মিলে ঠিক করে নে। তারপর ষ্টুডিবেকারটা নিয়ে ঘুরে ঘুরে দেখা ওকে সব। তোমাদের মত ছেলেমানুষদের সঙ্গে তাল ঠুকে চলা আমার এই বুড়ো বয়েসে পোষায় না মা।

কথা শেষ করেই মিঃ রায় উঠে পড়লেন। কিন্তু আমি উঠতে যেয়েও বাধা পেলাম :

—আঃ, উঠছেন কেন—বসুন। আমাদের প্রোগ্রামটা এখনই ঠিক করে ফেলি। রামায়ণে রাবণের ক্ষেদোক্তি পড়েননি? কোন মহৎ কাজ 'কাল'এর জন্য ফেলে রাখলে তা কালেই পেয়ে বসে!

স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে বলে গেল মালবিকা দেবী।

অগত্যা বসতে হল। অনসূয়া দেবী এক ছুটে কাগজ ও কলম এনে দিল মালবিকার হাতে। সে আবার সেটা প্রিয়ংবদা দেবীর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল :

—লেখা লেখি তুই-ই কর—তোর হাতের লেখা বেশ নাইস।

শেষ পর্য্যন্ত প্রোগ্রাম যা ঠিক হল তা এইরূপ :

আজ সকালে—অতিথিকে বাড়িটা ঘুরিয়ে দেখান।

বিকালে—আলিপুরের চিড়িয়াখানা।

কাল সকালে—দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দির।

বিকালে—ডায়মণ্ডহারবার।

পরশু সকালে—কালীঘাটের মন্দির।

পরশু দুপুরে—যাদুঘর।

তারপরদিন সকালে—বেলুড় মঠ।

বিকালে—মনুমেণ্টে ওঠা ও গঙ্গার ঘাটে বেড়ানো।

—ঠিক আছে এই পর্য্যন্তই থাক। বলে মালবিকা ওর শত্রুদের দিকে চেয়ে আবার বলে ঃ

—প্রোগ্রামের প্রথম আইটেম বাড়িটা দেখিয়ে আনি ওঁকে—চল সবাই।

—বাড়িটা দেখাতে তুমিই পারবে সখী, আমরা দু'জনে বরং আজকের রান্নার মেনু'টার তদারক করিগে।

বলল অনসূয়া।

—হ্যাঁ ভাই, তাই কর।

সমর্থন জানাল প্রিয়ংবদা।

—বেশ তোমরা দু'জনেই যখন বলছ।

বলতে বলতে উঠে পড়ল মালবিকা ঃ

—চলুন মিঃ চৌধুরী।

আমি মালবিকার কথামত উঠে পড়লাম। বলতে কুণ্ঠা নেই মালবিকার শত্রুদ্বয়ের এখনকার আচরণে মিত্রতার লক্ষণ পেয়ে আমি মনে মনে বেশ খুসীই হলাম।

প্রথমেই মালবিকা আমায় নিয়ে গেল সম্মুখের বিস্তীর্ণ তৃণাচ্ছাদিত লন ও তার দু'পাশের অংশটা দেখাতে। ফটকের দু'ধারে দুটো সুপুষ্ট পাম গাছ। ফটকের উপর দিয়ে নাম-না-জানা

কি এক বিলেতি লতার গাছ লতিয়ে উঠেছে। দু'দিকের দু'ফালি বাগিচায় নানা রকম বিচিত্র ফুলের গাছ। বাড়ীর লনে জনৈক ভৃত্য বড় আকৃতির একটা এ্যালসেসিয়ানকে শিকল টেনে বাগ মানাতে প্রাণান্ত হচ্ছিল। মালবিকা কাছে গিয়ে গম্ভীর গলায়—'টাইগার!' বলে ডাকতেই সে বেয়েড়া বায়না থেকে নিবৃত্ত হল।

—বাবার বিশেষ প্রিয় কুকুর এই টাইগার। এর পরিচর্য্যায় দিনের অনেকটা সময় ব্যয় করেন বাপি।

সামনের দিকটা দেখিয়ে মালবিকা আমায় নিয়ে চলল বাড়ীর পশ্চাদ্ভাগের বিস্তৃত অংশ দেখাতে। এই অংশে ঝাউ, পাম, পাতাবাহার থেকে সুরু করে কাঠ-মালতী, গোলাপ, বেল, যুঁই, টগর, বকুল অবধি নানা রকমারি ফুল ও গাছ স্থান পেয়েছে। এ ছাড়া আছে অর্কিডকুঞ্জ। তারেরা জালের ফ্রেমে নির্মিত দু'টি ঘরের একটিতে চারটি ময়ুর ও অপরটিতে দুটি হরিণ বন্দী দশায়ও সচ্ছন্দে বিচরণ করছে। মালবিকা বলল :

—এই হরিণদুটো আমার খুব প্রিয়। আমার শত্রুদের কিন্তু প্রিয় হল এই ময়ূর ক'টা।

—অনসূয়া রয়েছে প্রিয়ংবদাও রয়েছে—মৃগযূথও আছে দেখছি। আর তপোবনের কাজ বাড়ির এ অংশটা বেশ চালিয়ে দিতে পারবে বটে। তবে অভাব রয়েছে শকুন্তলা আর দুষ্মন্তের—সে অভাব মিটবে কি করে?

—আপনি বড় ইয়ে!

বলে কাপড়ের আঁচলে আঙ্গুল জড়াতে জড়াতে চঞ্চলপদে এগিয়ে গেল মালবিকা অর্কিডকুঞ্জের কাছাকাছি।

আমিও দ্রুত পায়ে এগিয়ে তার পাশে এসে বললাম :

—'ইয়ে' কথাটার মানে কিন্তু বাংলা শব্দকোষে পাইনি।

—বারে, শব্দকোষ-কারদের কি মাথা খারাপ হয়েছে নাকি, যে ওসব কথার মানে লিখতে যাবে ?

অর্কিডকুঞ্জ দেখে নিয়ে আমরা এলাম মাধবীকুঞ্জের কাছে। থোকা থোকা নরম কোমল মাধবী ফুল ঝুলে আছে লতাদের ডগায় ডগায়। কোথা থেকে এই সময় সপ্তরঙের পাখাওলা এক প্রজাপতি এসে বসল মালবিকার কুঞ্চিত কেশের ওপরে। সেদিকে দৃষ্টি পড়তেই আমি কৌতুক কণ্ঠে বললাম ঃ

—বাঃ, দেখুন-দেখুন আপনার মাথায় কি সুন্দর একটা প্রজাপতি !

কিন্তু আমার কথা শেষ হতে না হতেই প্রজাপতিটা উড়ে চলে গেল। মালবিকা অন্যমনস্কভাবে খানিক্ষণ উড়ন্ত প্রজাপতিটার গমনপথে চেয়ে রইল। ওর আনমনা মুখের দিকে চেয়ে আমি বললাম ঃ

—জানেন, আমাদের দেশে একটা প্রবাদ আছে রঙিণ প্রজাপতি মেয়েদের মাথায় বসলে শীগগির শীগগির বিয়ে হয় !

—ধ্যেৎ—বিয়ে হলেই হল আর কি ! কে বসছে বিয়ে ?

কথা কটা বলতে বলতে মালবিকার মুখ-চোখ তার পরণের শাড়ীর রঙের মতই লাল হয়ে উঠল।

আমরা আরও অনেকক্ষণ ধরে দুজনে ইতস্তত বেড়িয়ে বেড়ালাম উদ্দেশ্যহীনভাবে। তবে উদ্দেশ্য একটা কিছু ছিল বৈকি ! আর তা হল বোধহয় দু'জনের পাশাপাশি কাছাকাছি দু'জনেরই থাকার অদম্য স্পৃহা। ও কি ভাবছিল জানি না—আমি ভেবে রেখেছিলাম যে, ও না বলা পর্য্যন্ত এই ছায়াসুনিবিড় বন-বিথীকা ও ওর বাঞ্ছিত

সান্নিধ্য ছেড়ে যাবার প্রস্তাব করব না। হলও ঠিক তাই। ওই এক সময় বলল :

—এবার চলুন, ফেরা যাক—ওরা হয়ত কি ভাবছে !

—হ্যাঁ, তা ভাবতে পারে।

—কি ভাববে বলুন ত ?

—ভাবলে অনেক কিছুই ভাববে—আবার না ভাবলে কিছুই হয়তো ভাববে না।

আমার অদ্ভুত কথা শুনে ও তাকাল আমার চোখে। কিন্তু সহসা চোখ সরিয়ে নিতে পারল না ও। আমিও। আমরা উভয়ে যেন উভয়ের চোখে দেখলাম পরস্পরের এক নতুন রূপ। সে রূপের সঙ্গে আমাদের কারও এর আগে পরিচয় ছিল না। এক দৃষ্টির মাধ্যমেই আমরা উভয়ে যেন উভয়ের অন্তরের একান্ত কথাটা এক লহমায় পাঠ করে ফেললাম। সে কথাটা হল—ভালবাসি !

—বাবুজি !

—বলুন ওস্তাদজী ?

—কিছু যেন ভাববেন না, অনেক অবান্তর কথা হয়তো বলে ফেলছি। কি করব বাবুজী, আমার মনে সব কথাই যে ভীড় করে আসছে। তাছাড়া তাজমহলের প্রস্তররূপটাই ত তার সবটুকু নয়—তাজের আসল রূপ ছিল প্রেমিক সাজাহানের হৃদয়-গহণে ! আমিও আমার কথা বলতে গিয়ে আমার মনের মানুষটিকেই হয়তো বলে ফেলছি ! তাই বেশী বললে বা অবান্তর কিছু বললে, ক্ষমা করবেন।

—না, না, আপনি বৃথাই কুণ্ঠিত হচ্ছেন ! আমি যদি কিছু মনেই করব, তবে কলকাতা থেকে সাড়ে চার শ' মাইল ছুটে আসতাম না এই কাহিনী শুনবো বলে। আপনি নিঃসঙ্কোচে সব বলে যান।

শার্ঙ্গদেব আবার সুরু করেন ঃ

—বাবুজী, ভালবাসায় পড়লে নায়ক-নায়িকার অনুভূতির বর্ণনা এদেশী বা বিদেশী গল্প-উপন্যাস-কাব্যে অনেক পড়েছি। কিন্তু আমার মনে হয় ভালবাসার অনুভূতি বর্ণনা দিয়ে বোঝানো যায় না। প্রত্যেকের মনে ভালবাসাকে গ্রহণ করবার বা প্রকাশ করবার এক একটা স্বতন্ত্র ধারা থাকে। আর এ ধারা নিখুঁত বর্ণনা দিয়েও ঠিক ঠিক বোঝানো যায় না। বহু কিছুই অপ্রকাশ্য থেকে যায়।

বাগান থেকে ঘরে ফিরে এসে ভাবতে বসলাম নিজেকে নিয়ে। কিন্তু নিজেকে যেন আর বিচ্ছিন্নভাবে ভাবতে পারছি না। আমার

কথা ভাবতে গিয়ে ভেবে বসছি আমাদের কথা। আমাদের দৃষ্টিতে পৃথিবীর দিকে চেয়ে দেখলাম তা যেন বহু বহুগুণ রমণীয় হয়ে উঠেছে। মনেই হল না কালকের অতি পুরাতন জগৎটাই রয়েছে আজও। আর আমিও সেই পুরাতন একক আমি। মনে হল আমার দৃষ্টি-সম্মুখে যেন এক নতুন জগৎ সৃষ্টি হয়েছে। ইচ্ছে হ'ল কণ্ঠের সপ্তসুরের বাঁধন খুলে দিয়ে এমন কোন রাগিনী গেয়ে উঠি, যে রাগিনীর রাগরূপে দেখা যায় বিচ্ছেদহীন মিলনের মিথুন-আনন্দে নায়ক-নায়িকা প্রেমসাগরে ভালবাসার ভেলায় নিরন্তর ভেসে বেড়াচ্ছে!

আমি অবেলায়ও বিছানায় শুয়ে শুয়ে কাল সন্ধ্যা থেকে ঘটে যাওয়া দৃশ্যগুলি একের পর এক ভেবে মনে মনে রোমাঞ্চিত হ'তে লাগলাম। ভাবনার শেষ পরিচ্ছেদে মনের মাঝে আকাঙ্খা উঁকি-ঝুঁকি মারতে লাগল—আবার কখন না জানি সাক্ষাৎ পাব ওঁর। মনে হল ক'লকাতার আকাশ কি আজ শীঘ্র আবর্ত্তিত হ'য়ে সূর্য্যদেবকে পশ্চিম আকাশের দিকে দ্রুত ঠেলে নিয়ে যেতে পারে না?

অনেকক্ষণ পরে খাবার টেবিলে আবার ওর সাক্ষাৎ পেলাম। দেখলাম সকালের চেয়ে ওকে আরও অনেক সুন্দর দেখাচ্ছে। তথাপি ওর সৌন্দর্য্যের সবটুকু যেন প্রকাশিত হয়নি; লজ্জার ওড়নার ওর সৌন্দর্য্যের অনেকটাই যেন আবরিত রয়েছে। সে সৌন্দর্য্যটুকু দেখার অধিকার ত একজনই পাবে। সেই ভাগ্যবান কি আমিই? ভাবতেও কত না পুলক জাগে মনে। আজকে আমার মনের ক্ষুধা যেন প্রায় উদরপুর্ত্তির মত মিটেছে, তাই আহার্য্য বস্তু প্রতিদিনের মত খেতে পারলাম না। অনসূয়া দেবী অনুযোগ করল:

—সে কি, আপনি যে কিছুই খেলেন না।

—বিশ্বাস করুন, যতটুকু আমার প্রয়োজন, খেয়েছি।

মিঃ রায়েরও খাওয়া হয়ে গিয়েছিল ততক্ষণে। কিন্তু মেয়েদের খাওয়া তখনও অর্দ্ধেকটাই বাকী। মেয়েদের খাওয়ার ব্যাপারে ধীরে হাত চলাটা বোধ হয় 'ইউনিভার্সাল ট্রুথ'। মিঃ রায় বল্‌লেন ঃ

—তোরা ধীরে-সুস্থে খা, আমরা উঠে পড়ি।

আমি ও মিঃ রায় বাথরুমের দিকে এগিয়ে চললাম।

আমায় যেন কালগোণায় পেয়ে বসল। মধ্যাহ্ন আহার সেরে এসেই আবার ভাবতে সুরু করলাম—আবার কতক্ষণে না জানি দেখা পাব ওর। কিন্তু ভাগ্যদেবী আমার প্রতি বিশেষ সুপ্রসন্না ছিলেন। তাই ঘণ্টাখানেক অতিবাহিত হতে না হতেই হঠাৎই ও এসে আমার ঘরে ঢুকলো। হাতে ওর সঙ্গীত সম্মেলনের একটা স্যুভেনির। আমি যখন ভেবে ঠিক করতে পারছি না আমার মনের এ অবস্থায় ওকে বসতে বলা উচিত হবে কি না এবং ও যদি কিছুক্ষণ এ ঘরে বসেও তবে ওরা আবার কিছু মনে করতে পারে কি না—তার অবসরেই ও জিজ্ঞেস করে বসল ঃ

—আচ্ছা আপনার ত আবার ফিফথ সেশনে প্রোগ্রাম আছে, না ?

—হ্যাঁ।

—আমার প্রোগ্রাম আছে সিক্সথ সেশনে ; যদি আমি ওদের বলি আমার প্রোগ্রামটাও ফিফথ সেশনে করে দিতে, তবে কি ওরা কিছু ভাববে ?

—ভাববে কি না ? না, ভাববার আর কি আছে। অবশ্য ঠিক বলার মত করে বলতে না পারলে কিছু হয়তো ভাবতেও পারে।

—ভাবল ত বয়েই গেল আমার। অল্‌টার যদি না করে তবে প্রোগ্রাম করব না, না কি বলেন ?

—হ্যাঁ তা নাও করতে পারেন। তবে সেটা কি ভাল দেখাবে ?

—করব কি করব না সেটা পরে বিবেচ্য। আগে ত ওদের ফোন করি প্রোগ্রামটা অলটার করতে রিকোয়েষ্ট করে।

মালবিকা দ্রুতপায়ে আমার কক্ষ হ'তে নিষ্কান্ত হয়ে যায়।

কয়েক মিনিট পরেই ও আবার ফিরে এলো। উচ্ছ্বলকণ্ঠে বলল ঃ

—জানলেন, ওরা রাজী হয়ে গেল !

—রাজী হয়ে গেল ! একেবারে এক কথায় ?

—না, একেবারে এক কথায় নয়। প্রথমে বলল—সে কি করে হয়, অনেক ঝামেলা, পাবলিকের কাছে এ্যানাউন্স করতে হবে নিউজ পেপার মারফৎ। আমি তখনি ঝাঁ করে বলে বসলাম—তবে আমার প্রোগ্রাম ক্যান্সেল করছি। শুনে ওমনি তাড়াতাড়ি বলল—হ্যালো, শুনুন, ক্যান্সেল করার চেয়ে ফিফথ সেশনেই বরং ক'রে দিচ্ছি।

—দেবে না, সেদিন আপনার নাচের কেমন ওভেশান পেলেন ! খুশীর স্বরে বললাম আমি।

—কিন্তু আমার কাছে ওদের সবার ওভেশান একদিকে, আর এই ওভেশানটি······

বলতে বলতে ব্লাউজের ভেতর থেকে একটি বিশুষ্কপ্রায় গোলাপ-ফুল বের করে আমায় দেখিয়ে বলল ঃ

—একদিকে।

বলেই ক্ষিপ্রপদে চলে গেল ও। চলে গেল বটে, কিন্তু চলে যাওয়ার আগে যা বলে গেল তাতে আমার নিজের কাছে আমার 'আমি'র

মূল্যটা বড় বেশী মনে হল। একটা অদ্ভুত আনন্দে আমার অন্তর-আকাশ প্রভাত সূর্যের সপ্তরঙের মত ছটাময় হয়ে উঠল।

দুপুরে একটু তন্দ্রার মত হয়েছিলাম, লেডিস্ সুর খট্ খট্ আওয়াজে তন্দ্রা টুটে গেল। তবু আমি চোখ খুললাম না। যেমনটি ছিলাম তেমনিই অনড় হয়ে পড়ে রইলাম। লেডিস্ সু আমার ঘরে ঢুকলো: আরও কিছুটা এগিয়ে এলো খাটের কাছে। ও আমায় ডাকল:

—শুনছেন?

আমি তবু কপট নিদ্রায় আচ্ছন্ন। ও আবার ডাকল:

—শুনছেন?

আমার সাড়া নেই।

—ইস, কি বিপদেই পড়লাম!

এ পক্ষ তবু নিরুত্তর। লেডিস্ সু আবার দরজার দিকে এগিয়ে গেল। কড়া ধরে মৃদু নাড়ল। তবু ফল কিছু হল না।

—না, এ দেখছি একেবারে কুম্ভকর্ণের ঘুম। জাগতে জাগতে চিড়িয়াখানার গেট নির্ঘাত বন্ধ হয়ে যাবে।

অনন্যোপায় হয়ে লেডিস্ সু এগিয়ে এলো খাটের কাছে। ও আমার প্রশস্ত কাঁধ নাড়াতে ব্যর্থ চেষ্টা করল। এই অবসরে আমি খপ করে ওর একটা হাত ধরে ফেললাম!

—আঃ, কেউ দেখে ফেলবে যে, ছাড়ুন, ছাড়ুন?

ওর চোখে মুখে ভীরু বন্য হরিণীর উৎকণ্ঠা।

—চুপি চুপি পরপুরুষের ঘরে ঢোকা! মজাটা টের পাওয়াচ্ছি! দেখুক সবাই।

—চুপি-চুপি! কক্ষণও না। আমি রীতিমত জুতোর শব্দ

করতে করতে এসেছি। কেউ যদি ঘুমিয়ে থেকে শুনতে না পায়, সে দোষ কি আমার?

—আমায় ডাকা হল না কেন ?

এ প্রশ্নের জবাব না দিয়ে ও বলল ঃ

—দোহাই আপনার, ছাড়ুন, ছাড়ুন,। কেলেঙ্কারির একশেষ হবে কেউ দেখে ফেললে!

অতঃপর ছেড়ে দিলাম হাত। ও এক লাফে ঘরের বাইরে গিয়ে মুখ ভেংচিয়ে বলল ঃ

—ইস, ঘুম না হাতি। জেগে জেগে মজা করা হচ্ছিল। আর কখনও আসবো এ ঘরে! খুব শিক্ষা হয়েছে। চিড়িয়াখানায় কারো যাবার ইচ্ছে থাকলে চটপট রেডি হয়ে নিতে বলছে ওরা।

কথা শেষ করে চলে গেল ও। আমি স্প্রিংয়ের পুতুলের মত বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে উঠে পোযাক-পত্র পরতে মন দিলাম।

সবাই 'কার'-এ উঠে পড়লে আমাদের নিয়ে সোফারের হাতে প্রাণপাওয়া ষ্টুডিবেকার ময়দান দ্বিখণ্ডিত ক'রে ছুটে চলল খিদিরপুরের দিকে।

একসঙ্গে এতগুলি জন্তুজানোয়ার, পাখী, সরিসৃপ আমি ইতিপূর্ব্বে দেখিনি; পুঁথি-পুস্তকেই শুধু যা এদের পরিচয় পেয়েছিলাম। মালবিকাকে এ পরিবেশে পেলাম যেন এক নবপ্রাণময়ী রূপে। মুখব্যাদনরত জেব্রার মুখে ছোলা নিক্ষেপে, বানরের হাতে কলা গুঁজে দিতে, খাঁচার বাইরে বেরুনো বাঘের লেজ ধরে টেনে দিয়ে খুনসুড়ি করতে, অপূর্ব্ব ভঙ্গিতে আকাশ-উঁচুতে চেয়ে জিরাফের মাথা দেখতে—মালবিকা যেন আজ কোন কিশোরীর কাছ থেকে প্রাণ-প্রাচুর্য্য ধার করে নিয়েছিল।

চারটে দিন ঠিক যেন স্বপ্নের মধ্য দিয়ে কেটে গেল। আলিপুরের চিড়িয়াখানার চাঞ্চল্যে, দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দিরের শুচি-শুদ্ধতায়, ডায়মণ্ডহারবারের সুবিস্তৃত সমুদ্র-সৈকতে বিদায়ী সূর্য্যের শোভা দর্শনে, কালীঘাটের কালী মন্দিরের ভক্তিবিনম্রতায়, যাদুঘরের অস্থি-পঞ্জর-প্রস্তরে অতীত ইতিহাস পাঠে, বেলুড় মঠের পূত-পবিত্রতায় কোথা দিয়ে যে সময় অতিবাহিত হয়ে গেল নদীর প্রবল স্রোতের মত বুঝতেই পারলাম না।

আজ সঙ্গীত সম্মেলনের পঞ্চম অধিবেশনে আমরা দু'জনে যোগ দিতে যাব। পশ্চিমের পাটে সূর্য্যদেব বিদায় গোধূলিতে অদৃশ্য হবার আগে থেকেই আমাদের দু'জনের মনে সাজ-সাজ রব। সঙ্গে যাবেন মিঃ রায়। অনসূয়া ও প্রিয়ংবদার জন্য দুটি আসন সংরক্ষণের চেষ্টা করে বিফল মনোরথ হতে হল। আজ নাকি মালবিকার অদ্ভুতসুন্দর নৃত্য দর্শনের জন্যই টিকিটের এত চাহিদা।

যথাসময়ে আমরা গাড়ী থেকে নামতেই কর্ত্তৃপক্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ আমাদের স্বাগত জানালেন। আজকে আমার প্রোগ্রাম মালবিকার চেয়ে আগে সেট করা হয়েছে। তাই ওর এখন মেকআপ ও কষ্টিউম নেবার প্রয়োজন হবে না। আমরা তিন জনে হলে ঢুকে নির্দ্দিষ্ট আসন দখল করে বসলাম।

নির্দিষ্ট সময়েই পণ্ডিত রবিশঙ্করের সেতার দিয়ে অনুষ্ঠান সুরু হল। মুহুর্মুহু করতালির মধ্যে ভারত তথা বিশ্ববিখ্যাত সেতারিয়া পণ্ডিত রবিশঙ্কর তাঁর যন্ত্রের তারের ঝনৎকারে অপূর্ব শিল্পকারিতার পরিচয় দিলেন। আজকের অধিবেশনে বেশীর ভাগ শিল্পীই নামকরা। পণ্ডিত রবিশঙ্করের পরেই আসরে বসলেন আলি আকবর খাঁ। তিনি সরোদ বাদনে শ্রোতাদের মোহিত করলেন। এঁদের

পরেই আসরে বসলেন শ্রীচিন্ময় লাহিড়ী। শ্রীলাহিড়ী তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে ভৈরবরাগে খেয়াল গাইলেন।

শ্রীলাহিড়ীর পরেই আমার পালা। গুরুজীর নাম স্মরণ করতে করতে অডিটরিয়াম থেকে আসরে এলাম। মনে মনে ভেবে ঠিক করলাম যে "কুকুভা" রাগিনীতে খেয়াল গাইব। মানসে ভেসে উঠল গুরুজীর রাগবর্ণনার দৃশ্য। তিনি সংস্কৃত শ্লোক আউড়িয়ে তর্জমা করে বুঝিয়ে দিচ্ছেন—

"সুপোষিতাঙ্গী রতিমণ্ডিতাঙ্গী
চন্দ্রাননা চম্পকদামযুক্তা
কটাক্ষিণী স্যাৎ পরমা বিচিত্রা
দানেন যুক্তা কুকুভা মনোজ্ঞা।"

তরঙ্গকারের বর্ণনার উল্লেখ করে গুরুজী বুঝিয়ে দিয়েছিলেন— 'কুকুভা' রাগিণী নায়কের সঙ্গে যে বিহার করেছেন তার স্পষ্ট লক্ষণ মুখমণ্ডলে ফুটে উঠেছে। বক্ষদেশ ও মুখমণ্ডলে নখ ও দংশনাঘাতের চিহ্ন রয়েছে। নম্র তার কুচযুগল, বেশভূষাও ছিন্নভিন্ন। সমগ্র যামিনী বিহারে যাপন করে প্রভাতে অরুণোদয়ের সঙ্গে নয়নে পুনরায় দীপ্তি প্রকাশ পাচ্ছে। ললাটে তার সিঁদুর। সে ক্ষীণাঙ্গী, সর্বাঙ্গে ঘর্মবিন্দু, বক্ষের কাঁচুলি ও গ্রীবাদেশের কুসুমহার ছিন্ন।'

রাগালাপের পর সঙ্গীতের শিল্পকারিতায় নিমজ্জিত হলাম। চূর্ণ স্বরবিবর্ত্তনে যতপ্রকারে সম্ভব বৈচিত্র্য আনতে প্রয়াসী হলাম। অবশেষে গুরুজার কৃপায় এবারও সিদ্ধ হলাম। অজস্র করতালির মধ্যে আরও একখানা গাইবার অনুরোধ এলো। ছোট একটি ভজন গেয়ে উঠে পড়লাম আসর থেকে। শ্রোতৃমণ্ডলীর উদ্দেশ্যে নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিলাম।

আসনে ফিরে এলে মালবিকা অনুচ্চ স্বরে অভিনন্দন জানাল, মিঃ রায় জানালেন যে সেদিনের চেয়ে আজকের ডিমনষ্ট্রেশনই তাঁর ভাল লাগল। আরও দুজনের গান শুনে মালবিকা উঠে গেল মেক-আপ নিতে। এরপর জন তিনেক ওস্তাদের ডিমনষ্ট্রেশন হয়ে যাবার পর মাইকে ঘোষিত হল—এবারে আপনাদের নৃত্য পরিবেশন করবেন প্রখ্যাতা অভিজাত বংশীয়া নৃত্যশিল্পী কুমারী মালবিকা রায়। মালবিকার নাম ঘোষিত হওয়া মাত্রই চারদিক থেকে করতালির অভিনন্দন পড়ল।

কিছুক্ষণ পর যবনিকা উঠল। আজ আর এক সাজে সজ্জিতা মালবিকাকে মঞ্চোপরি দেখলাম। কোমর থেকে পা পর্য্যন্ত অনেকটা সেকালের বীর যোদ্ধাদের মত মালকোচা দিয়ে পরা বিশেষভাবে নির্মিত পোষাক। কোমর হতে দু'হাঁটু পর্য্যন্ত জরির কাজ করা কোঁচান ঝালর—এই ঝালরের দু'দিকের অংশ দু'পায়ের কাপড়ের সঙ্গে যুক্ত। বিশেষভাবে নির্মিত জরির কটিবন্ধ। কিছুটা জরির পাড়ওলা বস্ত্রাংশ অর্দ্ধ বৃত্তাকারে নিতম্বের উপর পড়েছে কোমর থেকে। অঙ্গে লাল আঁটোসাঁটো লো-কাট ভেলভেটের অঙ্গরাখা। অঙ্গরাখার নিম্নাংশে ইলাষ্টিক লাগান। যাতে উদরের সঙ্গে তা চেপে ধরে রেখে আব্রু রক্ষা করে। ফিকে নীল ভয়েলের মত পাতলা বস্ত্রাংশ কোচান অবস্থায় কাঁধের উপর দিয়ে নিয়ে গিয়ে নিতম্বের উপরে গুঁজে দেওয়া। বেণীর গোড়ায় রজনীগন্ধার মালিকা। গলায় সরু তিননরী মফচেন। হাতে চুড়ি, কানে ঝুমকো, মাথায় সীমন্তরেখা দ্বিখণ্ডিত করে এসে স্বর্ণনির্মিত টিকলি কপালের উপর শোভমান। হাতের বাহুতে ঝুমকো দেওয়া বাজুবন্ধ। পায়ে গোছা গোছা ঝুমুর।

সুরের তালে তালে সুরু হল নৃত্য। শিল্পীর চোখের ভ্রূ নাচে

নানা ভঙ্গিতে, নৃত্যের ভাবব্যঞ্জনার ছন্দে। আনন্দের আতিশয্যে কখনও সরু সরু ঠোঁট বিস্ফারিত হওয়ায় ফ্লাড লাইটের আলো পড়ে মুক্তাপাঁতি দন্তরাজি ঝিকমিকিয়ে ওঠে। আবার হয়তো পরক্ষণেই সারা মুখে নেমে আসে বিমর্ষতা।

মিনিটের পর মিনিট অতিক্রান্ত হয়। নৃত্যের তালের গভীরতায় যেন ডুবে যায় ওর সকল সত্তা। প্রক্ষিপ্ত আলোকছটায় পোষাকের রঙ পরিবর্ত্তিত হয় ক্ষণে ক্ষণে। দর্শকদের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে সদা পরিবর্ত্তনশীল ওর বহুরূপী রূপ। রজনীগন্ধার শুভ্রতা ক্রমে ম্লান হয়ে আসে। মাঝে মাঝে আঘাত সইতে অক্ষম তাদের ভীরু নম্র পাপড়ি খসে পড়ে। কখনও বা শিল্পীর মুদ্রা বিবর্ত্তনের তালে পদদলিত হয় পতিত পাপড়িগুলি। মুদ্রা থেকে মুদ্রান্তরে নেচে চলে মালবিকা। দরদর ধারে ঘাম ঝরে তার সারা স্বর্ণঅঙ্গ হতে। চোখেমুখে ছোঁয়া লাগে শ্রান্তির। তবু ছেদ পড়ে না নৃত্যের।

অবশেষে অজস্র করতালির রোলের মাঝে নমস্কারের ভঙ্গিতে নাচ শষ করে সে। বহুক্ষণ স্থায়ী সমবেত করতালি তাকে অভিনন্দন জানায়। আজও ওর নৃত্য-মুগ্ধদের দ্বারা আরও কয়েকটি পদক ঘোষিত হয়।

আরও কিছুক্ষণ অনুষ্ঠান উপভোগ করে অগণিত কৌতূহলী দর্শকদের মাঝ দিয়ে পথ করে গৃহাভিমুখী আমরা গাড়ীতে গিয়ে উঠলাম।

সেদিন বিকেলে কি একটা কাজে বাইরে গিয়েছিলাম। ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। পৃথিবীর বুকে নেমেছে তখন আবছায়া। রাত্রির অঙ্কে দিন বিলিয়ে দিচ্ছে নিজেকে নিঃশেষে। আপন মনে আমার ঘরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। কিন্তু কক্ষের অতি নিকটে এসে আমার চলায় ছেদ পড়ল। থমকে দাঁড়ালাম আমি। হ্যাঁ, আমারই ঘর থেকে নারী-কণ্ঠের চাপা কান্না ভেসে আসছে যেন! আরও একটু এগিয়ে কান পেতে রইলাম, যা অনুমান করেছি অভ্রান্ত। কান্নাই বটে। দরজায় সন্তর্পণে চাপ দিলাম; খুলে গেল। পা টিপে টিপে ঘরে ঢুকলাম। ঘরে তখন আবছা আবছা আলোর রাজত্ব। দু'তিনবার ভাবলাম আলোটা জ্বালব, না জ্বলবনা? অবশেষে না জালাই সাব্যস্ত করলাম। ধীরে ধীরে পালঙ্কের কাছে এগিয়ে গেলাম। দু'তিন বার হাত বাড়াতে গিয়েও মালবিকাকে স্পর্শ করব কিনা ভেবে স্থির করতে পারলাম না।

অবশেষে ভেবে দেখলাম যে আমরা মনের দিক থেকে উভয়ের প্রতি উভয়ে যতদূর এগিয়েছি তাতে স্পর্শ করলে এমন কিছু অন্যায় হবে না। ওর পিঠে হাত রাখতেই ও বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত উঠে পড়ল! পরক্ষণেই আমার বক্ষে ঝাঁপিয়ে পড়ল ছোট্ট মেয়েটির মত। আমি বিশেষ বিচলিত বোধ করলাম। উত্তেজনায় ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছে ওর। চাপা কণ্ঠে বললাম :

—কি হয়েছে বলত, কান্না কেন?

—আমি তোমায় ছেড়ে থাকতে পারব না। কিছুতেই না!

বলে ও ফুপিয়ে কেঁদে উঠল।

—এই জন্যে এতটা অধীর হয়েছ তুমি ?

বলতে বলতে ওর মুখে চোখে সান্ত্বনার হাত বুলিয়ে দিতে লাগলাম আমি। পরম নির্ভরতায় ও আমার বুকে মাথা রেখেই কান্না-কণ্ঠে বলল :

—তুমি একটা কিছু বিহিত না করলে আমি আত্মঘাতী হব—এই বলে রাখলাম।

কথা শেষ করেই ও আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে দ্রুতপদে কক্ষ হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল। কিছুক্ষণ বিমূঢ়ের মত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে সুইচের কাছে গিয়ে আলো জ্বাললাম। পাখাটাও চালালাম। মাথার মধ্যে যেন আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে গেল মালবিকা। কি করব এখন আমি ? কি করতে পারি ? কোন অধিকারে আমি ওকে দাবী করব ? ভিন্ন প্রদেশবাসী এক অজ্ঞাত অপরিচিত যুবকের হাতে কি করে কোন স্নেহশীল পিতা তার একমাত্র আদরের তুলালীকে তুলে দিতে পারে ? তাছাড়া মালবিকা হল এ বংশের একমাত্র অমাবস্যার সলিতা। ছেলে বলতে, মেয়ে বলতে ঐ একটিই। ওই পাবে রায় বংশের বিপুল সম্পত্তির অধিকার। আর সেই কিনা আমায় না পেলে আত্মঘাতী হবে ? ভাগ্যের এ কি নিষ্ঠুর পরিহাস! জীবন দেবতার কাছে প্রশ্ন করলাম—কি আমার কর্তব্য ?

সে রাত্রিতে আমার ঘুম হল না। এতদিন শুধু শুনে এসে-ছিলাম সঙ্কটের রাত্রি দীর্ঘ হয়। আজ নিজের অভিজ্ঞতায় বুঝলাম কথাটা ঠিকই। সেই দীর্ঘ রাত্রি আমি কাটালাম নানা এলোমেলো চিন্তাচক্রের চারিদিকে ঘুরে। কিন্তু এ চক্র যেন কলুর ঘানির মত—যেখান থেকে সুরু করছি শেষও হচ্ছে সেখানেই এসে। সারা-

খাবার সেরে কফির কাপে চুমুক দিতে না দিতেই মালবিকা এসে গেল। ঘরের একটা সোফায় বসে অনুচ্চ স্বরে বলল :

—কাল অনসূয়া আর প্রিয়ংবদাকে দিয়ে বাবার কাছে প্রস্তাব পেশ করেছিলাম।

—সত্যি বলছ ?

—না, তোমার সঙ্গে রঙ্গ-রস করছি। আর এটা তারই সময় কি না!

—আ-হা-হা, চট কেন, কি বললেন তিনি তাই বল না চটপট ? আমার যেন আর তর সয় না।

—খুব আশাপ্রদ কিছু নয়।

—তবে আর কি হ'ল ?

চুপসে গেলাম আমি।

—তুমি একটুতেই বড় অধীর হয়ে পড়। ওরা যা বলল তাতে বুঝলাম, বাবা চান যে, তোমার দিক থেকে একটা এ্যাপ্রোচ হোক। জানত আমরা বনেদী জমিদার বংশ। মেয়ের বিয়ের জন্য প্রৌঢ় বয়েসী বাবা তোমার মত এক ছেলেমানুষ নব্য যুবকের কাছে প্রস্তাব পেশ করতে সঙ্কোচ বোধ করছেন।

—ইস্, তবে আমিই বা করব কেন! হাজার হলেও পাত্রপক্ষ বলে কথা।

—তোমার ত সঙ্কোচের বড় বালাই। সঙ্কোচ থাকলে কার মাথায় প্রজাপতি পড়ছে, বা কার শীগ্‌গির বিয়ে হচ্ছে, তা নিয়ে গবেষণা করতে যেতে না। আর হাজারো লোকের মধ্যে অমন অন্তর্ভেদী দৃষ্টি ফেলে ড্যাবড্যাব করে চেয়েও থাকতে না!

—ওরে দুষ্টু!

বলে ওর বিনুনী ধরে এক টান মারতেই ও ভীতকণ্ঠে বলে উঠল :

—উঃ লাগছে, ছাড়ো ছাড়ো ! বাব্বা বাবা, কি সর্ব্বোনেশে লোক তুমি ! মেয়েদের চুল ধরতে আছে ? আয়ু কমে যায় যে !

বলে বিনুনীর অভিশাপ খণ্ডন করতে তাতে একটু থুতু ছিটিয়ে নিল।

—বল তবে, কখন তোমার বাবার কাছে বলতে যাবো।

—ওঃ, একেবারে বীরপুরুষ এলেন যেন ! আধমরা করে এনে পায়ের কাছে ফেলে দিলে শিকারী বনতে চান ?

—রেগেছ ? বিলিভ মি, রাগলে তোমায় ভারী সুন্দর লাগে।

—থাক থাক, আর চাটুবাক্য আউড়াতে হবে না।

—চাটুবাক্য নয় গো সুন্দরী, সত্য বাক্যই বলছে এ দাস। তোমার বাবার কন্যার কাছে জানতে চাইছি, কখন জমিদার সাহেবের মন-মেজাজ ভাল থাকে। আরে এত বোঝ আর এটা বুঝলে না, ঝোপ বুঝে ত কোপ মারতে হবে ?

—বাবা রাসভারি হলেও বদমেজাজি লোক নন। মেজাজ ওঁর সব সময়েই ভাল। তবে নিরিবিলি না হলে ত এ কথা বলতে পারবে না। তাই রাত্রি আটটা-সাড়ে আটটাই হ'ল তোমার পক্ষে প্রশস্ত সময়। বুঝলে ?

কথা শেষ করে 'আমি এখন যাই' বলে চলে গেল ও।

মালবিকা অতি সহজে পথ বাতলে চলে গেল বটে, কিন্তু সে দুস্তর পথে অগ্রসর হওয়া যে কত কঠিন, তা আমি ক্ষণপরেই বুঝলাম। কি ভাবে যে মিঃ রায়ের কাছে মনের কথাটা প্রকাশ করব তা কিছু-তেই ভেবে পারছিলাম না আমি। অনেকক্ষণ ধরে ভেবে ঠিক

করলাম যে,—মে আই কাম ইন—বলে ঘরে ঢুকে সোজাসুজি বলে বসব—আমি আপনার কন্যা মালবিকাকে ভালবাসি !

কিন্তু কানে বড় বাজল কথাটা। নাঃ, ভালবাসাটা যত সহজ; গুরুজনের কাছে তা প্রকাশ করাটা দেখছি অতি দুরূহ ব্যাপার। আবার মনে হল—যেই আমি বলব, মালবিকাকে ভালবাসি, অমনি যদি তিনি ফস করে বলে বসেন—কিন্তু বৎস, সেও যে তোমাকে ভালবাসে তা জানলে কি করে ? তখন কি প্রমাণ নিয়ে, কেমন করে আমার আবেদনের সারবত্তা প্রমাণ করব ?

এরপর নানাভাবে ভেবে স্থির করলাম যে সোজাসুজি বলে বসব—আমি আপনার মেয়েকে বিয়ে করতে চাই। কিন্তু কথাটা বড় নগ্ন হয়ে বাজল কানে। তাই স্নান খাওয়ার সময় বাদে সারাদিন ধরেই আমি কি করে আমার মনের কথা প্রকাশ করব ঐ রাশভারি লোকটির কাছে সে বিষয়ে মনে মনে নানাভাবে তালিম দিয়ে চললাম।

পৃথিবী আপন কক্ষে আবর্ত্তিত হয়ে সূর্য্যকে অর্দ্ধবৃত্তাকারে প্রদক্ষিণ করে এলো। দিনের আলো বিদায় নিল পৃথিবী থেকে ; নেমে এলো রাত্রির তমিস্রা। তবু আমি মনস্থির করে উঠতে পারলাম না। সন্ধ্যা ঘোর হয়ে যাবার কিছু পরে মালবিকা এলো সারাদিনের অদর্শ-নের পর। বললাম অকপটে সমস্যার কথা। সে অভয় দিয়ে বলল :

—ঠিক সময় এলে সবই ঠিক হয়ে যাবে। অত ভাবছ কেন ?

মনে মনে ভাবলাম ওর মুখে ফুল চন্দন পড়ুক। আহা, তাই যেন হয়।

অবশেষে নির্দিষ্ট সময় এলো। আমি অস্বাভাবিক পর্য্যায়ের হার্টবিট নিয়ে মালবিকার বাবার সেক্রেটারিয়েট কক্ষের পর্দার বাইরে এসে দাঁড়ালাম। মনের সঙ্গে শেষ বোঝাপড়া করে নেবার জন্য সিল্কের পর্দার আড়ালে বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম। তারপর কি মন্ত্রবলে জানি না, ঠিক চরম সময়টিতে মনের সব সঙ্কোচ ঝেড়ে ফেলে বললাম :

—মে আই কাম ইন ?

বললাম বটে, তবে স্বরে যে কম্পন অনুভূত হল তা বলাই বাহুল্য। ওধার থেকে জলদগম্ভীর কণ্ঠ ভেসে এলো :

—ইয়েস ?

কুণ্ঠিত পদে ঘরের দামী কার্পেটের উপর দিয়ে পদক্ষেপের পর পদক্ষেপ ফেলে আমি এগিয়ে যেতে লাগলাম। চেয়ারে ডুবে বসে থাকা মিঃ রায় লাইব্রেরী ফ্রেমের চশমার ফাঁক দিয়ে বারেক আমায়

দেখে আবার চোখ রাখলেন সামনের কোন দলিল-দস্তাবেজের উপর। আমি তাঁর টেবিলের প্রায় কাছাকাছি গেলে তিনি বললেন :

—বস বাবা।

বসলাম একটা চেয়ারে। ঘরে জমাট নিস্তব্ধতা। মাথার ওপরের ঘূর্ণায়মান পখাটারই যা অতি তুচ্ছ শব্দ। নিঃসীম নিস্তব্ধতায় অনেকক্ষণ কেটে যাবার পর মিঃ রায়ই আবার বললেন :

—বল বাবা, কি বলবে ?

আমি অবশেষে বেমানানভাবে অতি কুণ্ঠিতস্বরে বলে বসলাম :

—যদি অনুমতি করেন, একটা কথা বলব।

—বেশ'ত বল না। অত সঙ্কোচ কিসের ?

—বলছিলাম কি, যদি আপনার অনুমতি পাই, আমি আপনার কন্যার……

শেষ কথাটা 'পাণি-গ্রহণ করতে চাই' জিভের ডগায় এসেও কেমন যেন আটকে গেল শুকিয়ে ওঠা ওষ্ঠপ্রাচীরে। সে প্রাচীর ভেদ করে প্রকাশ করতে পারলাম না। ঐটুকু কথা বলতেই আমি গলদঘর্ম হয়ে উঠেছিলাম। মিঃ রায় আমায় এ অবস্থা থেকে মুক্তি দিলেন।

—বুঝেছি ইয়ংম্যান, তুমি কি বলতে চাইছ। স্বীকার করলাম, বোথ অফ ইউ আর ইন লাভ অফ ওয়ান এ্যানাদার। কিন্তু সেইটুকুই ত সব নয় ? লোকাচার, দেশধর্ম, সোশ্যাল ষ্ট্যাটাচ ইত্যাদি বিষয়-গুলিও ত দেখবার আছে। আমাদের দেশের সমাজ ত ওয়েষ্টার্ণ কান্‌ট্রির মত নয়—যে 'লভ' হলেই অতি সহজে বিয়ে হয়ে যেতে পারে। তবে হ্যাঁ, আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে এ ব্যাপারে খুব একটা অরথডক্স নই। আমার মেয়ে যদি সুখী হয়, আমি ইণ্টার-প্রভিন্স কেন, ইণ্টার-কাষ্ট ম্যারেজেও আপত্তি তুলবো

না। আর তুমি ত ইয়ংম্যান আমাদের স্বজাতিই। তাছাড়া আমার মতে রুচি-প্রকৃতিতে ও শিক্ষা-দীক্ষায় তুমি অযোগ্য নও। আমার ভাবী জামাতাকে বিত্তশালী হতে হবে—এও আমি চাই না। কেননা, আমি নিজে বিশেষ বিত্তবান। শুধু একটি বিষয়ের উপর আমার মত দেওয়া বা না দেওয়া নির্ভর করবে—আর তা হল তোমাদের বংশমর্য্যাদা। মলি আমার একমাত্র মেয়ে। বিপুল সম্পত্তির সেই উত্তরাধিকারিণী। তাই তাকে আমি সবদিক দিয়েই জীবনে সুখী দেখতে চাই। এইজন্যই তার ভালবাসার পাত্রকে সে জীবনে পাক, এ আমিও চাই আন্তরিকভাবে। কিন্তু তাই বলে বংশ-মর্য্যাদাহীন কারও সঙ্গে তাকে পাত্রস্থ করতে পারব না এইজন্য যে, এর বিষময় ফলে উভয়ের মাঝে মতবৈষম্য দেখা দেবে। আশা করি, আমি যা বলছি, তুমি তা ফলো করতে পারছ। আর এটাও স্বীকার করবে যে, আমি খুব একটা ইনজাষ্টিস করছি না তোমাদের উপর।

—আমার দৃঢ়বিশ্বাস, আমাদের বংশমর্য্যাদা সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে আপনি সন্তুষ্টই হবেন।

—বেশ, আমি তবে কাল বা পরশুর ট্রেণেই বেনারস যাব। তুমি শুধু আমার হাতে তোমার মুনিমজীকে চিঠি দিয়ে দিও, যাতে আমায় তিনি সহায়তা করেন।

—বেশ, তাই হবে। কিন্তু একটা অনুরোধ আছে আমার।

—বল ?

—আমার গুরুজীকে বিয়ের ব্যাপারটা আগেই জানাবেন না।

—কেন, তাঁর কি এ বিয়েতে মত হবে না ?

—না, তা নয়। তবে তিনি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনে জীবন কাটানোটাই বিশেষ পছন্দ করেন। তাই এখন বিয়েতে হয়তো বাদ সাধবেন।

—বেশ তাঁকে জানাব না, আমি কথা দিচ্ছি।

বাবুজি! বললে বিশ্বাস করবেন না, আমি যখন মিঃ রায়কে প্রণাম করে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম, তখন যেন আমার শরীরের ওজন অর্দ্ধেকেরও বেশী হাল্কা হয়ে গেছে! আমার মনে হল মালবিকার বাবার মত ভাল বাবা কেন পৃথিবীর ঘরে ঘরে থাকে না।

হাওয়ার দোলায় ভাসতে ভাসতে আমার ঘরে ঢুকে স্মুইচ অন করতেই সারা ঘর আলোয় ভরে উঠল। আর সবিস্ময়ে দেখলাম, আমার ঘরের সোফায় চুপটি করে বসে আছে চিন্তান্বিতা মালবিকা। আমি দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে তার কাছে ছুটে যেয়ে বুকে জড়িয়ে ধরলাম তাকে। বুঝলাম তার তনুদেহ আমার বাহু-মধ্যে ঈষৎ কম্পমান। তাতেও না দমে মনের আনন্দের স্পর্শ এঁকে দিলাম তার কুমারীকপালে—আমার জীবনের প্রথম চুম্বনে!

ও কম্প্রকণ্ঠে বলল:

—একি, হঠাৎ এত খুসী যে! কি হ'ল তোমার?

—আজও যদি খুসী না হব, তবে খুসী হব কবে? ইস্ মলি, আমার যে কি আনন্দ হচ্ছে! মনে হচ্ছে পাগলা ভোলার মত দু'হাত তুলে নৃত্য করি!

—আর আমি ধরি ভৈরব রাগে খেয়াল, তবেই সোনায় সোহাগা হবে!

হাসতে হাসতে কৌতুককণ্ঠে বলল মালবিকা।

—তবুও আমি প্রাণখুলে বলব,

একি আনন্দ রে!
বসন্ত এলো আজি হৃদয় দ্বারে!!

চাপা স্বুরে প্রকাশ করলাম আমি মনের ভাষা।

—আঃ, পাগলামি বন্ধ করত ? সবাই এক্ষুনি ছুটে আসবে যে !

আমাকে সামলাতে না পেরে ধমক দিল মালবিকা।

—চুপটি করে বসে বলত কি কথা হল বাবার সঙ্গে ?

ওর সিরিয়াসনেস-এ আমি অনেকটা প্রকৃতিস্থ হয়ে আদ্যপ্রান্ত সব কিছু বললাম ওকে। সব শুনেও কিন্তু আমার মত ও উৎফুল্ল হল না। বলল :

—জানত, বাবার ধমনীতে বাংলাদেশের বনেদী জমিদার বংশের রক্ত প্রবাহিত। বংশমর্য্যাদা বলতে তিনি কি জানতে চান, আগে থেকে আঁচ করা সম্ভব নয় !
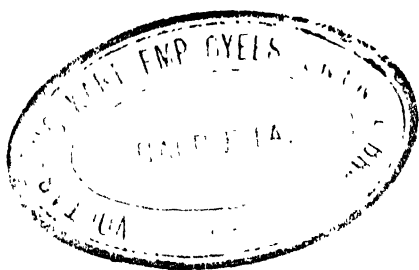
কিন্তু মালবিকার বাবার বনেদী রক্তও শেষ পর্য্যন্ত আমাদের মিলনের পথে অন্তরায় হল না। তিনি খুসী মনেই ফিরে এলেন বেনারস হতে। সেইদিনই পুরোহিতকে ডেকে বিবাহের দিনও স্থির করে ফেললেন। সাতদিন পরেই একটি ভাল দিন আছে। সারাবাড়ীতে এক অভূতপূর্ব প্রাণবন্যার জোয়ার বইলো। এদিকে 'ইণ্টার প্রভিন্সিয়াল ম্যারেজ' বলে 'ম্যারেজ রেজিষ্ট্রারের' কাছে রেজিষ্ট্রেশনের ব্যবস্থাও করা হল।

আমি মুনিম চাচাকে টেলিগ্রাম ক'রে দিলাম, তার পেয়েই চলে আসতে। তিনি বিশেষ বিজ্ঞ ব্যক্তি। তাঁকে বেশী লেখা বাহুল্য-মাত্র।

অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা সেদিন থেকেই আমাকে পাকাপাকিভাবে দুষ্মন্ত বলে ডাকতে সুরু করল। সুযোগ পেলেই কথায় কথায় ওরা আমাদের উভয়ের নাম জড়িয়ে ঠাট্টা-তামাসা করতে লাগল।

কদিন পর সেদিন রাত্রিতে আমি চিন্তামুক্ত মন নিয়ে গভীর নিদ্রায় অভিভূত হতে পারব বলে মনে মনে স্থিরনিশ্চয় হয়ে রইলাম। কিন্তু রাত্রিতে শয্যার আশ্রয় নিয়ে দেখলাম যে আমি যা ভেবেছিলাম তা একেবারেই ভুল। আমি মনকে মোটেই চিন্তামুক্ত করতে পারলাম না। তবে এখন আমার মানসিক চিন্তা-স্রোত ভিন্ন পথে প্রবাহিত হল। সে চিন্তায় ছিল বিবাহিত জীবনের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্যের পথে যাত্রা সুরুর পরিকল্পনা। সেই খাদে আমার মন নতুন করে চিন্তা সুরু করল।

অনেক রাত্রি ধরে নানা চিন্তায় সময় কাটিয়ে সবে মাত্র একটু

তন্দ্রার মত হয়েছি। এমন সময় কার চাপা কণ্ঠের আহ্বান পেলাম :

—এই, শুনছ ! দোর খোল ?

পরক্ষণেই কপাটে মৃদু করাঘাত। আমি স্বর শুনেই বুঝতে পেরেছিলাম, এ কার কণ্ঠ। অতি সন্তর্পণে আমি বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লাম। আলো না জ্বালিয়েই দরজা খুললাম নিঃশব্দে। এক ঝলক জ্যোৎস্নার আলো ঘরে ঢুকল সে পথে। চাপা কণ্ঠে শুধালাম :

—কি ?

—বেরিয়ে এসো !

—কোথায় ?

—আরে এসোই না !

—যদি কেউ দেখে ফেলে ?

—বয়েই গেল !

আমি আর কথা না বাড়িয়ে সাবধানে দরজা ভেজিয়ে বাইরে এলাম। পরক্ষণেই ও আমার একটা হাত ধরে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে চলল।

ওদের বাড়ীর পেছনদিককার বাগানে এসে তবে ও গতি মন্থর করল। আমার মন ততক্ষণে কেমন যেন মোহাবিষ্ট হয়ে পড়েছে। এমন রোমাঞ্চিত বাঞ্ছিত পরিবেশের নিদ্রাভিভূত পৃথিবীতে আজ শুধু আমরা দু'টি মানুষ জেগে আছি। ভাবতেও কত ভাল লাগে ! আমি মালবিকার পাশাপাশি এগিয়ে বকুল তলায় এসে পড়লাম। এখানে একটা সান বাঁধান ছোট বেদীর ওপর আমায় হাত ধরে টেনে বসাল ও। ধীর শান্ত প্রকৃতির দিকে চেয়ে দেখলাম। মন কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে উঠল। প্রেম-কম্প্র কণ্ঠে ডাকলাম :

—মালবিকা !

ও ছোট্ট করে উত্তর দিল :

—উঁ ?

আমাদের উভয়ের দু'জোড়া উজ্জ্বল চোখ বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখতে লাগল রূপোঝরা জ্যোৎস্নালোকে প্লাবিত নৈশ পৃথিবীর পরম রমণীয় সে রূপ।

এক সময় বললাম ওকে :

—আকাশ থেকে আজ এমন নির্ম্মল জ্যোৎস্নাধারা কেন নেমে আসছে বলত ?

—আমাদের মাথায় সুধা বর্ষণ করতে।

—বকুল কেন ফুল ঝরাচ্ছে ?

—আমাদের আশীর্ব্বাদ জানাতে !

—তারারা কেন হাসি মুখে মিটমিট করে চাইছে ?

—আমাদের মিলনে মুগ্ধ হয়েছে বলে।

—ঝাউয়ের পাতায় বাতাস লেগে ও কিসের শব্দ হচ্ছে ?

—এ মধু যামিনীতে আমাদের মিলনের আনন্দ-সঙ্গীত।

—আমি কে ?

—পুরুষ।

—তুমি ?

—প্রকৃতি।

—আমাদের মিলন কি আজকের ?

—না, যুগ-যুগান্তের।

আমি আনন্দে আবেশে ওকে কাছে টেনে নিয়ে অস্ফুট মৃদুস্বরে বললাম :

—এত কথা তুমি কার কাছে শিখলে মালবিকা ?

—যৌবনের কাছে !

পাশের এক আম গাছে কাক-জ্যোৎস্নায় বিভ্রান্ত এক কোকিল ডেকে উঠল ঃ

—কু-উ-উ ! কু-উ-উ !

কোকিলের ঐ মিষ্টি মধুর স্বর নৈশ নিস্তব্ধতায় ভর করে দিক-দিগন্তে মিলিয়ে গেল।

আমরা দু'জনে দু'জনের দৃষ্টিতে সমতা এনে একই অনুভূতি নিয়ে চেয়ে রইলাম তারকা খচিত জ্যোৎস্নাধোয়া আকাশের পানে। এক সময় মনে হল, আকাশ হতে যেন ভালবাসার নীল নীল সোহাগ নেমে আসছে আজকের এ জ্যোৎস্নাধারায়। দূরে একটা তারা খসে পড়ল আকাশ থেকে। তা দেখে ও বলল ঃ

—দেখছ, তারারা আমাদের কাছে চলে আসতে চাইছে।

অনেকক্ষণ কেটে গেল এই ভাব-বিহ্বল মধুর মুগ্ধতায়। একসময় ও আমার কানের কাছে মুখ এনে অস্ফুটস্বরে বলল ঃ

—একটা গান শোনাও না ?

—মুখের সঙ্গীত ত অনেক শুনেছ, শুনবেও। আজ আমার বুকের মাঝে যে আনন্দ-সঙ্গীতের সুরমূর্চ্ছনা চলেছে তাই শোন কান পেতে।

মিষ্টিমধুর কটাক্ষ হেনে মালবিকা আমার বুকে মুখ লুকাল। আমি ওর মুখে মাথায় ভালবাসার হাত বুলিয়ে দিতে লাগলাম। মনে মনে ভাবলাম, এ রাত্রির স্মৃতি জীবনস্মৃতির পৃষ্ঠায় সোনার আখরে লেখা থাকবে বুঝি যুগে যুগে।

একসময় মালবিকা মুখ তুলে আমার চোখে চেয়ে বলল :

—এবার যাবে ?

—কেন, আরও একটু থাকি না।

—না, বেশী রাত জাগলে শত্রুরা ঠিক ধরে ফেলবে।

বাধ্য হয়ে উঠে পড়লাম আমরা। বাগিচার কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় মনে মনে প্রতিটি লতা-বৃক্ষকে সম্বোধন করে বললাম :

—তোমরাই সাক্ষী রইলে আমাদের এ মিলন মধুর মুহূর্তের।

সাতটা দিন যে কোথা দিয়ে কি করে কেটে গেল ! ঠিক যেন স্বপ্নের ঘোরে অতিবাহিত করলাম এ ক'টি দিন। ইতিমধ্যে মুনিম চাচা এসে গিয়েছিলেন। তিনি ফর্দ্দের পর ফর্দ্দ করে চললেন। তাঁর আনন্দ আর ধরে না ! বাবার কাছে তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, আমাকে মানুষ করে সংসারী করে দিয়ে তবে তিনি ছুটি নেবেন। আজ তাঁর সে প্রতিশ্রুতি পরিপূর্ণ হওয়ার শুভলগ্ন সমাগতপ্রায়। একে তিনি মফঃস্বল শহরের লোক—তায় মনিব পুত্রের বিয়ে—তিনি যেন গোটা কলকাতা শহরটাই খরিদ করে আনতে চাইলেন। একদিন তিনি আমায় ও মালবিকাকে সঙ্গে নিয়ে মার্কেটিংয়ে গেলেন। উভয়ের পছন্দমত অনেক টাকার শাড়ী গহনা কেনা হল 'হগ মার্কেট' থেকে।

অবশেষে এলো সেই শুভলগ্ন। বাজি-বাজনা, আচার-অনুষ্ঠান, যাগ-যজ্ঞের ভেতর দিয়ে শুভবিবাহ সম্পন্ন হল। মুনিমচাচা প্রথমে আপত্তি জানালেও আমি বলে কয়ে তাঁকে রাজি

করলাম সম্পূর্ণ বাঙ্গালী মতে বিবাহের সকল আচার অনুষ্ঠান করতে।

বাবুজী, বাসরঘরে আপনাদের বাঙ্গালী মেয়ে-বৌদের চাপল্যের দৃশ্য আজও আমার স্মৃতিপটে জ্বলজ্বল করছে। কতভাবেই না তাঁরা বর বেচারাকে বোকা সাব্যস্ত করতে চেষ্টা পেলেন। সত্যিকথা বলতে কি তাঁদের বুদ্ধি ও বাকচাতুর্য্যে সেদিন আমি বিস্ময় না মেনে পারিনি। বিবাহের রোমাণ্টিক দিকটা এরা যেন বহুগুণে বাড়িয়ে দেয়।

স্থির ছিল ফুলশয্যার পরের দিনই আমরা বেনারস রওনা হব। পাছে বাঙ্গালী মতে বিবাহের আচার অনুষ্ঠানে কোন ত্রুটি হয়, তাই ফুলশয্যাও এখানেই সেরে যাওয়া ঠিক হল। বিয়ের দিনই গুরুজীকে টেলিগ্রাম করে সুখবরটা জানিয়ে দিয়ে তাঁর আশীর্ব্বাদ চেয়ে পাঠিয়েছিলাম।

ফুলশয্যার দিনের ছবি আজও আমি যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। সারাদিন ধরে অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা কত যত্ন করে একটা বিরাট ঘরে কারুকার্য্য খচিত পালঙ্ককে অজস্র পুষ্পরাজি ও পত্রনিচয়ে সুসজ্জিত করে তুলল। তাদের সঙ্গে আরও অনেক কুমারীকন্যা ও যুবতী বধূ হাত মিলিয়েছিলেন।

একসময় নারীবাহিনী আমায় নিয়ে চললেন সেই পুষ্পখচিত কক্ষে। মেয়েদের সে কি কলকাকলি! তাঁদের প্রত্যেকের মনের সব আনন্দ যেন উছলে উছলে উঠছে কথায়, হাসিতে, কৌতুকে।

ফুলশয্যার ঘরে ঢুকে বাঙ্গালী মেয়েদের রুচির যে নিদর্শন পেলাম পালঙ্ক ও কক্ষের অঙ্গসজ্জায়, তাতে মনে মনে তাদের উদ্দেশ্যে প্রণিপাত

না ক'রে পারলাম না বাবুজী। মেয়েদের অনুরোধ উপরোধে পালঙ্কে উঠে বসলাম, আমি পালঙ্কে উঠে বসামাত্রই নারীবাহিনীর সদস্যবর্গ হুড়মুড় করে বেরিয়ে গেল কক্ষ থেকে।

কিছুক্ষণ পর আবার তাদের কলকণ্ঠ নিকট হতে নিকটতর হতে লাগল। দরজার দিকে চোখ তুলে দেখলাম মালবিকাকে একরকম পাঁজা কোলে করেই ওরা নিয়ে আসছে। লজ্জাবিধূরা ওকে ঘরে ঢুকিয়ে দিয়েই মেয়েরা বাইরে থেকে দরজা টেনে দিল।

পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে মালবিকার দিকে চেয়ে দেখলাম—অঙ্গে সকল ভূষণের চেয়ে লজ্জা ও কুণ্ঠার ভূষণে তার রূপমাধুরী অনুপম হয়ে উঠেছে। ও ধীরে ধীরে কপাটের কাছে গিয়ে দরজায় খিল এঁটে দিল। তারপর ধীর পদবিক্ষেপে খাটে এসে বসল পা ঝুলিয়ে। আমি ওর দু'বাহু ধরে আকর্ষণ করতেই আজকের ব্রীড়াময়ী বধূ কুমারীর কুণ্ঠাভরে হাত সরিয়ে দিল আমার।

আমি অস্ফুটে বললাম ঃ

—উঠে এসো ?

—না।

—কেন ?

চোখেমুখে ওর লজ্জার রক্তিম আভা।

আর কোন কথা বলল না ও। আমি দু'হাত ধরে ওকে জোর করে কাছে টেনে নিলাম। দল মেলবার প্রতীক্ষায় নিরত ঠিক যেন একটি কমলকোরক। এই সময় হঠাৎ ঘরের বাইরে সমবেত হাসির রোল শোনা গেল। আমি কুণ্ঠাভরে দূরে সরে বসলাম। কিন্তু শ্বশুরমশায়ের তিরস্কার কানে এলো ঃ

—ওখানে কি হচ্ছে তোমাদের, যাও, রাত্রি অনেক হয়েছে, এবার সব শুয়ে পড়গে।

বেশ কিছুক্ষণ আমরা পরস্পর পরস্পরের কাছ থেকে দূরে বসে রইলাম। একে একে অনেকগুলি পদশব্দ দূরে মিলিয়ে গেলে আমি আবার ওকে কাছে টেনে নিলাম। ফুলশয্যায় বোধ হয় অনেক বরের বলা একটা পুরাতন কথাই নূতন করে বললাম :

—তোমায় আমি কি নামে ডাকবো ?

—যে নামে তোমার খুসী।

কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে বললাম :

—বেশ, তোমায় ডাকবো আমি মালিনী বলে, কেমন ?

ঘাড় বেঁকিয়ে সম্মতি জানাল মালবিকা। ও আরও একটু কাছে সরে এসে সারামুখ তার অনন্য হাসিতে উদ্ভাসিত করে গভীরস্বরে শুধায় :

—তুমি সুখী হয়েছ ?

—আমার চোখে চেয়ে দেখ, এর উত্তর লেখা আছে।

মালিনী দু'তিনবার আমার চোখের দিকে চাইতে গিয়ে সরমতাড়িতা হয়ে ব্যর্থ হল। আমি জোর করে ওকে কাছে টেনে নিয়ে ওর চোখে চোখ ফেলে হাসিমুখে বলি :

—দেখ ত সুখী হয়েছি কিনা ?

এরপর কয়েকটি মুগ্ধ-মুহূর্ত্ত নীরবে বয়ে গেল। একসময় ওর দিকে চেয়ে বললাম :

—কি ভাবছ মালিনী ?

সুখের দীর্ঘশ্বাস ফেলল ও। বলল :

—ভাবছি, তোমাদের সংসারে গিয়ে সবকিছু মানিয়ে নিতে পারব ত ?

—সংসার বলতে ত তুমি আর আমি, আমি আর তুমি !

—আশীর্ব্বাদ কর, তোমার যেন উপযুক্ত হতে পারি।

—তুমিও আশীর্ব্বাদ কর······

বলতে যাচ্ছিলাম, মালিনী হাত বাড়িয়ে আমার মুখে চাপা দিয়ে ভ্রূভঙ্গি করে বলল :

—ছিঃ ছিঃ, ওকথা মুখে এনো না, আমার অকল্যাণ হবে যে ! স্বামী যে গুরুজন।

ওর শঙ্কাকুল মুখভাব দেখে আমার খুব হাসি পেল। আমি হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওকে আরও নিবিড়বন্ধনে বাহুবদ্ধ করলাম। মনে হল আকাশ থেকে বুঝি তেত্রিশ কোটি দেবদেবী আমাদের দুটি সুখী মানব-মানবীর প্রতি কল্যাণ বর্ষণ করছেন। আর তাই যদি না করবেন—আমাদের গভীর প্রেম, অন্তরনিঙড়ানো ভালবাসা কেন এমন কানায়-কানায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে। আমি অন্তরের গভীর ভালবাসার ইঙ্গিতে ওর সুন্দর রক্ত-বিম্বাধরে এঁকে দিতে উদ্যত হলাম একটি আবেগচুম্বন। এমন সময় কড় কড় করে প্রবল শব্দে বেজে উঠল এ কক্ষের একমাত্র দরজার কড়া। সঙ্গে সঙ্গেই কানে এলো চার অক্ষরের একটি কথা :

—টেলিগ্রাম !

মনে মনে ভাবলাম, গুরুজীর আশীর্ব্বাদ বয়ে এনেছে এ টেলিগ্রাম ! মালিনীর দিকে চেয়ে দেখলাম উত্তেজনায় ওর বক্ষস্পন্দন বেড়ে গেছে। ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলছে ও। ওকে হাসিকণ্ঠে বললাম :

—গুরুজীর টেলিগ্রাম !

বলেই একলাফে পালঙ্ক থেকে নেমে খুলে দিলাম দরজা। সঙ্গে সঙ্গে একটি হাত আমার দিকে টেলিগ্রামটা বাড়িয়ে দিল। এ আমার বহু প্রতিক্ষীত টেলিগ্রাম! আমার শিল্পী-জীবনের পথিকৃতের শুভেচ্ছাপুরস্কার! দ্রুতহাতে খুলে ফেললাম খামটা। ততোধিক দ্রুত চোখ বুলিয়ে গেলাম ইংরেজী শব্দগুলোর উপর দিয়ে :

Guruji seriously ill. Come sharp.

Kamta Prosad

গুরুজী সংঘাতিক অসুস্থ! মুহূর্ত্তে আমার মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ল! এমন মিলন-মধুর রোমাঞ্চিত নিশীথে একি দুঃসংবাদ বয়ে আনল এ টেলিগ্রাম? আমি ছুটতে ছুটতে মুনিমচাচার ঘরে গেলাম। মুনিমচাচা টেলিগ্রাম দেখে আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন :

—ঘাবড়ানেকা কৈ বাত নেহি বেটা। কালহি হামলোগ জরুর চালা যায়গা। আভি যাও বেটা, আরাম করো।

যে চাকর টেলিগ্রামটা নিয়ে আমায় দিয়েছে, তাকে শুধু মারতে বাকী রাখলেন শ্বশুরমশায়। আমি ধীরপদে আবার ফুলশয্যার কক্ষে ফিরে এলাম। ঘরে ঢুকে দেখলাম বালিশে মুখ গুঁজে ফুলে ফুলে কাঁদছে মালিনী। আমি এগিয়ে এসে তার পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললাম :

—এ শুভদিনে কাঁদতে নেই, মালিনী!

কিন্তু কথা বলতে যেয়ে আমার কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হয়ে এলো। আমি যেন সব পৌরুষ হারিয়ে ফেলেছি। আমার মন থেকে সব আবেগ যেন নিঃশেষ হয়ে গেছে।

মালিনী মুখ তুলে ভীরু চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল :

—ওগো, কি হবে ? আমার যে বড় ভয় করছে।

বলে আবার উচ্ছ্বসিত আবেগে কেঁদে উঠল ও।

—না না, ভয়ের কিছু নেই। মানুষের ত কত অসুখ-বিসুখই হয়ে থাকে।

ব'লে আমি দরজায় খিল দিয়ে দিলাম। পালঙ্কে উঠে বসে আবার সেই আগের মত ওকে আদর করে কাছে টেনে নিতে গেলাম। কিন্তু কি এক শঙ্কায় পারলাম না। মনের সঙ্গে অনেক বোঝাপড়া করেও আগের সেই স্বাভাবিক সুরটি ফিরিয়ে আনতে পারলাম না। মালিনী আমার চিন্তা-গম্ভীর মুখের দিকে চেয়ে বলল :

—কি অত ভাবছ ? ভাগ্যের ওপর ত কারও হাত নেই। শুয়ে পড় এবার।

কিন্তু আমি শুতে পারলাম না। আমার মানসপটে প্রতিনিয়ত সেই তপঃক্ষিন্ন ব্রাহ্মণের রোগজর্জর মুখচ্ছবি ভেসে উঠতে লাগলো। দেখলাম, মলিন জীর্ণ শয্যায় শুয়ে গুরুজী রোগ-যন্ত্রনায় ছটফট করছেন। আর ডেলিরিয়ামের মাঝে বার বার উচ্চারণ করছেন আমারই নাম।

—গুরুজী !

বলে উচ্ছ্বসিত আবেগে আমি কেঁদে উঠে দু'হাতে মুখ ঢাকলাম।

আমাদের ফুলশয্যার সব ফুল যেন কয়েক মুহূর্ত্তেই বাসী হয়ে গেল !

পরদিন প্রভাতের আগে থেকেই প্রকৃতিতে সুরু হল যেন প্রলয়ঙ্কর তাণ্ডব। সারা আকাশ ঘন কালো মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে এলো। থেকে থেকে মেঘের কোলে ছটফট করছে বিদ্যুৎ। এখানে সেখানে কড় কড় কড়াৎ করে বজ্রপাত হচ্ছে। শন্ শন্ করে বইছে প্রবল বাতাস। আর সেইসঙ্গে অঝোরে ঝরছে বাদলধারা।

সবাই বলল আজকের দিনটা থেকে যেতে। মুনিমচাচাও বুঝালেন অনেক। কিন্তু আমাকে প্রতিনিবৃত্ত করতে পারল না কোন উপদেশ, কারও আবেদন। অষ্টপ্রহর আমার মনে আর কোন চিন্তা নেই; কেবল গুরুজীর কথা। শেষ পর্য্যন্ত আমার জেদই বজায় থাকল। কলকাতার সিটি বুকিং থেকে টিকিট কিনে আনা হল। আমরা যথাসময়ে রওনা হলাম বেনারসের পথে।

আমাদের দু'জনের টিকিট কাটা হয়েছিল ফাষ্ট ক্লাসের। আর মুনিমচাচা বোধ হয় ইণ্টার ক্লাসের টিকিট কেটেছিলেন। সারা রাস্তা বাইরের প্রকৃতিতে সমানে চলল সেই দুর্যোগ। ট্রেণ চলার শব্দের সঙ্গে বৃষ্টি-বাদলের শোঁ-শোঁ শব্দ মিশে একাকার! আমি একবার একটু বসছি, পরক্ষণেই আবার উঠে অস্থিরভাবে পায়চারি করছি। কামরায় আমরা দু'জন ছাড়া অন্য কোন প্যাসেঞ্জার ছিল না; থাকলে আমায় ঠিক রাঁচীর পাগলা গারদের কোন আসামী ভাবত। মালিনী আমায় নানাভাবে প্রবোধ দিতে চেয়েও ব্যর্থ হল। এমন কি আমি তার প্রতি নববধূর প্রাপ্য যথাযোগ্য সম্ভ্রমটুকু দেখাতেও ভুলে গেলাম। টেলিগ্রাফ পাওয়ার পরক্ষণেই

আমি যেন সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বভাবের হয়ে গিয়েছি। এ আমির মাঝে যেন পূর্ব্বের আমি হারিয়ে গেছে।

বেনারস ক্যাণ্টনমেণ্টে গাড়ী থামামাত্রই আমি গাড়ী থেকে নেমে পড়লাম। মুনিমচাচা সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কামরায় এসেপড়েছিলেন। মালিনী ও সঙ্গের মালপত্রের ভার তিনি সামলাবেন জানতাম। তাই কালবিলম্ব না করে আমি একটা টাঙ্গায় চেপে ছুটলাম গুরুজীর কুটিরের উদ্দেশ্যে।

যা অনুমান করেছিলাম, ঠিক তাই। গুরুজীর শেষ সময় সমাগতপ্রায়। ইতিমধ্যেই দু'একবার শ্বাসকষ্ট হয়েছিল, এখন একটু স্বাভাবিক বোধ করছেন। জীবন-প্রদীপ নিভবার আগে ক্ষণিকের প্রজ্বলন। আমাকে দেখে তিনি কঠিন স্বরে বললেন :

—এই যে নবাব-নন্দন, এতক্ষণে আসা হল ? আমি তোমার জন্য এদিকে ছটফট করছি। নিশ্চিন্তে মরতেও পারছি না ভগবানের নাম স্মরণ করে। আর তুমি কিনা পড়ে থাকলে কলকাতায় ?

———— .

একটু থেমে টেনে টেনে দু'চার বার নিশ্বাস নিয়ে আবার বলতে লাগলেন :

—শার্ঙ্গদেব, তোমার নিশ্চয়ই স্মরণ আছে যে, আমি তোমায়ই আমার প্রধান শিষ্যরূপে গ্রহণ করেছিলাম। কিন্তু তুমি ব্রহ্মচর্য্য পালনে পরাঙ্মুখ হওয়ায় তোমার সে যোগ্যতা বিনষ্ট হয়েছে। সঙ্গীত সাধনার জিনিষ। যে কোনরূপ মানসিক চাঞ্চল্য সাধনার পরিপন্থী। সারা জীবনের কঠোর সংযমে আমি একদিকে ভগবৎ আরাধনা ; আর অন্যদিকে সঙ্গীত-সাধনাকে সমান মনে করে এসেছি। সেই

সঙ্গীতের উত্তরসাধক হিসাবে তোমায় রেখে যাব ভেবেছিলাম, কিন্তু তুমি আজ তোমার উপযুক্ততা হারিয়েছ।

এতগুলি কথা বলে রীতিমত হাঁফাতে লাগলেন গুরুজী।

—গুরুজি! মুহূর্ত্তের ভুলের জন্য আপনার প্রিয়তম শিষ্যের প্রতি নির্দয় হবেন না।

আমি উচ্ছ্বসিত কান্নায় গুরুজীর পায়ে মাথা কুটতে লাগলাম।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন গুরুজী। তারপর বিগলিত নয়নে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন :

—বেটা শারং, তোকে ত আমি শিষ্য বলেই শুধু ভাবিনি। সংসার বিবাগী স্বজনহীন তপস্যাক্লিষ্ট ব্রাহ্মণের মনে যে কণামাত্র অপত্য স্নেহ ছিল, তা যে আমি তোর জন্যই সঞ্চয় করে রেখেছিলাম। সে সব অপাত্রে অর্পণ করতে আমারই কি মন চায়রে? এখনও আমি আমার সারাজীবনের সাধনালব্ধ পুঁথিপত্র তোকে দিয়ে যেতে পারি, যদি……

—বলুন গুরুজী, যদি……

আমি গুরুজীর রোগপাণ্ডুর ক্ষীণ হাত ধরে মিনতি করলাম। একটু গুম্ হয়ে থেকে হঠাৎ বলতে স্বুরু করলেন গুরুজী :

—হ্যাঁ বলব, আমায় বলতেই হবে শারং। আমায় কঠোর হতে হবে—অতি কঠোর। সাধনার ক্ষেত্রে কোন দুর্ব্বলতাকে প্রশ্রয় দিলে চলবে না। শোন্ বেটা, আমার সঙ্গীত-সাধনার সব রাগ-রাগিনীর বিভিন্ন প্রকাশভঙ্গীর নিদর্শনমুলক পুঁথিপত্র তোকেই দিয়ে যেতে পারি, যদি তুই এই মৃত্যুপথ যাত্রী ব্রাহ্মণের পদস্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা করতে পারিস, যতদিন পর্য্যন্ত না আমার পুঁথিপত্রে সারাজীবনে সঞ্চিত সকল রাগ-রাগিনী উপযুক্তভাবে রেওয়াজ করে আপন কণ্ঠে

ধারণ করতে সক্ষম হবি, ততদিন তোকে কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করতে হবে।

—গুরুজী! নববিবাহিত এক যুবকের প্রতি এ কি কঠিন আদেশ আপনার?

—হ্যাঁ, কঠিন আদেশ! সঙ্গীতের সিদ্ধিলাভ শুধু কঠিন তপস্যায়ই সম্ভব। সাধনার ক্ষেত্রে সংযমহীনের প্রবেশ নিষেধ। এই আমার শেষ কথা।

বলতে বলতে নিদারুণ অভিমানে গুরুজী আমার দিক থেকে পাশ ফিরে শুলেন। উত্তেজনায় তখন ঘনঘন শ্বাস পড়ছে তাঁর।

দুর্য্যোগদিনের আকাশে বিদ্যুৎঝলকের মত আমার মনাকাশে মালিনীর গত রাত্রির কান্না-করুণ মুখখানা ভেসে উঠে মিলিয়ে গেল। তবু নিষ্ঠুর আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, যত সত্বর সম্ভব সব রাগ-রাগিনী আয়ত্ব করে নিয়ে তারপর তাকাব সংসারের দিকে; আমার মালিনীর দিকে। কঠিন অঙ্গীকারে গুরুজীর পা ছুঁয়ে প্রায় বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললাম:

—আমি সঙ্গীতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বাগ্দেবীর নামে শপথ করে বলছি, যতদিন পর্য্যন্ত না প্রকৃত উত্তরসাধকের মর্য্যাদা রক্ষা করে আপনার পুঁথিপত্র থেকে আমার অনধীত রাগ-রাগিনী আপন কণ্ঠে ধারণ করতে পারব, ততদিন কঠিন ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করব!

কথা শেষ করে আমি ডুকরে কেঁদে উঠলাম, বাবুজী! কিন্তু অন্যদিকে আনন্দে প্রশান্তিতে ঝলমল করে উঠল গুরুজীর রোগপাণ্ডুর, মৃত্যুর ছায়া পড়া মুখ-চোখ। তিনি তাঁর শীর্ণ দক্ষিণ হস্তের অনামিকা দিয়ে অদূরে রক্ষিত একটা জীর্ণ পেঁটরার প্রতি নির্দেশ করলেন। গুরুজীর অন্যতম শিষ্য কামতা প্রসাদ সেই পেঁটরা খুলে পুঁথিপত্রগুলো

বের করে আনল। গুরুজী এক এক করে তাঁর সবকিছুই আমার হাতে তুলে দিলেন। আমি সে সব গ্রহণ করলাম। ভক্তিভরে কপাল ঠেকালাম তাতে।

গুরুজী অন্যান্য শিষ্যদের ডেকে বললেন ঃ

—আমাকে তোরা এতদিন গুরু হিসাবে যে ভক্তি, শ্রদ্ধা, সম্মান করতিস, আজ থেকে তার সব কিছু পাওয়ার অধিকার অর্জ্জন করল শার্ঙ্গদেব। অগ্নি স্পর্শ করে সমবেতস্বরে তোরা বল ঃ

—শার্ঙ্গদেব আমাদের গুরু!

অপর শিষ্যরা সেইরূপই করল। গুরুদেব অতঃপর আমার দিকে চেয়ে বললেন ঃ

—বৎস শার্ঙ্গদেব, আজ দ্বিপ্রহরেই আমি দেহরক্ষা করব। তৎ-পূর্ব্বেই আমায় গঙ্গাতীরে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করবে। আর আমার শবদেহ দাহ করবার আবশ্যক হবে না, গঙ্গার গৈরীক সলিলে বিসর্জন করলেই আমার আত্মা তৃপ্তিলাভ করবে।

দ্বিপ্রহরের আর বড় বাকী ছিল না। তাই আমি অপরাপর শিষ্যদের সঙ্গে পরামর্শাদি করে গুরুজীকে দশাশ্বমেধ ঘাটে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করলাম। কীর্ত্তনীয়াদের খবর দিলাম কৃষ্ণ-নাম শোনাবার জন্য।

বাবুজী, আশ্চর্য্যের বিষয় যে, ঠিক যথাসময়ে গুরুজী আমাদের শোকসাগরে ভাসিয়ে, আমার কোলে মাথা রেখে মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা করলেন। আমি দ্বিতীয়বার পিতৃহারার মত কেঁদে উঠলাম। মানসপটে ভেসে উঠল তাঁর শাসন ও সোহাগের কত টুকরো স্মৃতি। পিতৃদায় হলে যা যা করতে হয় সে সবই আমি পালন করব বলে মনস্থ করলাম।

শবদেহ বিসর্জ্জন দিয়ে, গঙ্গায় স্নান করে, গলায় উত্তরী ও পরিধানে নববস্ত্র ধারণ করে সন্ধ্যার আগ দিয়ে বাড়ী ফিরলাম। মালিনী আমায় সে বেশে দেখে উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। আজই যে সব শেষ হয়ে যাবে তা কি মালিনী কি মুনিমচাচা, কেউই ভাবেননি। মালিনী বাড়িতে পা দিয়ে অল্প সময়ের মধ্যেই তার সংসার বুঝে নিয়েছিল। মুনিমচাচার নির্দ্দেশমত আমাদের উভয়ের বিছানা করেছিল দোতালার বড় ঘরটায়। তথাপি আমি পাশের ঘরে কুশ-শয্যায় শয়ন করবার সঙ্কল্প জানালাম। শুনে তার সারামুখ মুহূর্ত্তে বিমর্ষতার কালো মেঘে ছেয়ে গেল।

এগার দিন পর মহাধূমধাম করে গুরুজীর শ্রাদ্ধ-শান্তি চুকিয়ে দিলাম। যথাসাধ্য করল অন্যান্য শিষ্যরাও।

শ্রাদ্ধ চুকে যাবার পরদিন মালিনী আমায় একান্তে পেয়ে ঠাট্টা করে বলল :

—ঋষিবরের নিদ্রার ব্যবস্থা কি আজ থেকে এ দাসীর কক্ষেই করা হবে ?

তার কথায় মনে মনে কৌতুক অনুভব করলেও বাইরের গাম্ভীর্য্য বজায় রেখেই থম্‌থমে স্বরে বললাম :

—না, আমার শোবার ব্যবস্থা যেমন হয়, পাশের ঘরেই হবে।

অনুভব করলাম যে এ অচিন্ত্যপূর্ব্ব কথা শুনে মালিনীর মুখমণ্ডল মুহূর্ত্তে মৃতের মুখের মত ফ্যাকাশে হয়ে গেল! বাবুজী, তবু আমি সঙ্কল্পে অটল রইলাম।

একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছি বাবুজী, অনসূয়া ও প্রিয়ংবদাও আমাদের সঙ্গেই এসেছিল। শ্বশুরমশায় জানিয়েছিলেন যে, ওরা

আবাল্য এক সঙ্গেই লালিত-পালিত, তাই মালিনীর সহচরী হিসাবে ওরা ওর সঙ্গেই থাকতে চায়। আমি আপত্তি করিনি। মুনিমচাচাও সানন্দে সম্মতি জানিয়েছিলেন। তিনি হয়ত ভেবে-ছিলেন যে, ভিন্ন প্রদেশের মেয়ে মালিনী নতুন পরিবেশে এসে হাঁপিয়ে উঠবে। আমাদের শত আপত্তি সত্বেও ওদের জন্য মাসিক তিনশত টাকা বরাদ্দ ছিল শ্বশুর মশায়ের।

গুরুজীর শ্রাদ্ধ-শান্তি চুকে যাবার পরের দিন থেকেই আমার পূর্ণ সাধনা সুরু হল। সারাদিন ধরে অর্গলবদ্ধ ঘরে বসে নিবিষ্ট মনে গুরুজীর পুঁথিপত্র অধ্যয়ন করে রাত্রির নিরবতার মাঝে স্বর সাধনা সুরু করি। এক একদিন রাতের শেষ প্রহর অবধি চলে আমার সে সাধনা। এইভাবে ক্রমে ক্রমে মালিনী ও আমার মাঝে ব্রহ্মচর্য্যের অদৃশ্য এক কঠিন ব্যবধান-প্রাচীর গড়ে উঠল।

প্রতি রাত্রিতে আমি যে রাগ বা রাগিনী কঠোর পরিশীলনে কণ্ঠে ধারণ করি, পরদিন সেই রাগ বা রাগিনী আমার গুরুভাইদের শিখিয়ে দিই। অবশ্য সবসময় যে ওরা সব রাগ-রাগিনী কণ্ঠে তুলে নিতে পারত তা নয়—তবু আমি চেষ্টার ত্রুটি করি নি।

গুরুদেবের কাছে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, সে কথা আমি বাড়ীর কাউকেই জানালাম না। এমনকি মুনিমচাচাকেও না। পরন্তু আমার গুরুভাইদেরও বিশেষভাবে বারণ করে দিয়েছিলাম, এ সব কথা ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ না করতে। মনে মনে আমি মতলব এঁটে রেখেছিলাম যে, হঠাৎই যেমন আমার মালিনীকে বিবাহিত জীবনের সব চাওয়া ও পাওয়া থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে সুরু করেছি, তেমনি হঠাৎই একদিন ওকে বিস্মিত করে আবার আমার একান্ত কাছে টেনে নেব।

সারাদিন আমি এমন ভাবে চলাফেরা করতে লাগলাম, যাতে করে বেশীবার আমি ও মালিনী একান্তে মিলিত হবার সুযোগ না পাই। নেহাৎ সাংসারিক দু'চারটে কথা ছাড়া আমি মালিনীর সঙ্গে বাক্যালাপ প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলাম। শুধু তাই নয়, ব্রহ্মচর্য্য কথাটার ব্যাপক অর্থের প্রতি অতি সচেতন ছিলাম বলে কদাপি তার মুখের দিকেও চাইতাম না। প্রায়ই তার সঙ্গে মাটির দিকে চেয়েই কথা বলতাম। মুহূর্ত্তের জন্যেও যদি আমি আমার কঠিন প্রতিজ্ঞার কথা বিস্মৃত হতাম, সঙ্গে সঙ্গে মানসপটে ভেসে উঠতো গুরুজীর মৃত্যু-দৃশ্য।

রাত্রি দশটার মধ্যেই আহারাদি শেষ করে আমি বাড়ীর সম্মুখের বাগানের দিকে মুখ করে বারান্দার বেদীর উপরে আসন নিয়ে বসতাম। তারপর ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমার চলত সুর-সাধনা। যে সাধনায় আমি মাঝে মাঝে এমন তন্ময় হয়ে যেতাম যে বাহ্যজ্ঞান বলে কিছু থাকত না।

রাত্রিজাগরণের সুবিধার জন্য আমি মাঝরাতে এক কাপ করে কফি খেতাম। এতদিন এই কফি নিয়ে আসত দাসীরা। কিছুদিন হল কফি দেবার ভার নিয়েছে মালিনী নিজেই। বোধ হয় সারাদিন কখনও আমায় কাছে পায়না বলে এই কফি দেবার অছিলায় ও আমার কাছে আসার সুযোগ করে নিয়েছিল। কিন্তু আমি তখন রেওয়াজের মাঝে এমন তন্ময় হয়ে থাকতাম যে তৃতীয়-পক্ষ কারও উপস্থিতি প্রায় দিনই টের পেতাম না। অনেক দিন এমনও হত—কফি খেতেই ভুলে যেতাম বা খেতে গিয়ে দেখতাম তা জুড়িয়ে একেবারে জলের মত ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। এ জন্য মালিনী ইদানিং জলের ধর্মানুসারে তা যত ডিগ্রী গরম হতে

পারে, শেষ মাত্রা অবধি গরম করে দিত। যাতে অনেকক্ষণ পরে খেলেও তা কিছুটা গরম থাকবার সম্ভাবনা থাকে।

এইভাবে মাস দশেক কেটে যাবার পর একদিন মুনিমচাচা আমায় একান্তে ডেকে খোলাখুলি ভাবেই জানতে চাইলেন যে, আমি এ বিয়েতে অসুখী হয়েছি কিনা। আমি প্রবলভাবে আপত্তি জানিয়ে বললাম যে, অমন কথা যেন কেউ চিন্তাও না করে। তিনি জানতে চাইলেন, তবে কি কারণে আমি মালিনীকে এড়িয়ে চলি। আমি অকপটে জানালাম যে বিশেষ কোন সাময়িক কারণেই আমায় এরূপ আচরণ করতে হচ্ছে।

এই ঘটনার কিছুদিন পরেই হঠাৎ একদিন কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে মুনিমচাচা পরলোকের পথে যাত্রা করলেন। মৃত্যুশয্যায় আমাকে আমার কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে পরামর্শ দিয়ে বলে গেলেন যে, ধর্মসাক্ষী করে 'প্রতিগৃহ্নামি' বলে যাকে বরণ করে আনা হয়েছে তিনিই আমাদের গৃহলক্ষ্মী—তাঁর প্রতি সকল দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য যথাযথ না করলে পাতক হতে হবে। বিবাহের মন্ত্রের দ্বারা স্ত্রীর খাওয়া পরার দায়িত্বই শুধু নেওয়া হয় না ; সেই সঙ্গে তার শারীরিক ও মানসিক সকল সুখের দায়িত্বই নেওয়া হয়।

একটা কথা অকপটে স্বীকার করব বাবুজী, বাঙ্গালী মেয়েদের মত বুঝি ভারতের অন্য কোন প্রদেশের মেয়েরা অত ধৈর্য্যশীলা হয় না। আমার তরফ থেকে এত অবহেলা, এত অবজ্ঞা পেয়েও মালিনী কখনও আমার কাছে আমার আচরণ সম্পর্কে কৈফিয়ৎ চায় নি। জানিনা তার তুল্য দেবীর মত মেয়ে বাংলা দেশে ক'জন আছে। কিন্তু বাবুজী, ওর ধৈর্য্যের কথা ভাবলে আমার বিস্ময়ের সীমা-পরিসীমা থাকে না

কিন্তু মালবিকার শত্রুরা—অনস্থূয়া আর প্রিয়ংবদা একদিন আমায় আক্রমণ করে বসল। তবে তাদের আক্রমণ যে সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত ছিল তা আমি সেদিনও যেমন জানতাম, আজও জানি। কিন্তু আমি কি করে অমন যে নিষ্ঠুর হয়েছিলাম তখন, তা ভাবলে আমার বুকের সব দীর্ঘশ্বাস একই সঙ্গে বেরিয়ে আসতে চায় বাবুজী।

সেদিন রাত্রের আহার শেষ করে বাইরের বেদীতে গিয়ে সবে বসেছি। এমন সময় অনস্থূয়া ও প্রিয়ংবদা সেখানে এসে হাজির হল। খাওয়ার পর মশলা খেতাম আমি। তাই নিয়ে এসেছে একটা বিরিদানিতে করে। আমার দিকে সেটা বাড়িয়ে ধরে অনস্থূয়া বলল ঃ

—মহারাজ দুষ্মন্ত, যদি এ অবলাদের অভয় দেন তবে একটা কথা জিজ্ঞেস করি।

—সূর্য্যবংশ অবতংশ কখনও কোনকালে নারীদের ভীতির কারণ হয় নি। নির্ভয়ে বলতে পার।

—বলছিলাম কি, শকুন্তলার প্রতি এমন আচরণ করাটা কি যুবজানি দুষ্মন্তের উচিত হচ্ছে? হাজার হলেও সে বালিকা বধূ ত বটে!

রহস্য করে কথাটা বললেও আমি কিন্তু সেটা রহস্যচ্ছলে নিতে পারলাম না বাবুজী! উত্তরে আমি অত্যন্ত কর্কশভাবে বললাম ঃ

—আমি চাই না যে আমাদের স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ নিয়ে তৃতীয়পক্ষ কেউ কটাক্ষ করে।

একথা শুনে সেই যে ওরা দুজনে বিষণ্ণ গম্ভীরমুখে চলে গেল, আর কোনদিনই আমার সামনে ওদের হাসতে দেখিনি।

ইতিমধ্যে ভারতের বিভিন্ন দেশীয় রাজ্য থেকে মালিনীর কয়েকটা 'কল' এলো নৃত্য প্রদর্শনের জন্য। আমিই উপযাজক হয়ে ওর মানসিক অবস্থার কথা ভেবে ওকে যেতে বললাম। প্রথমে ও আপত্তি জানালেও শেষ পর্য্যন্ত গেল। ওর সঙ্গে গেল অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা। এ ছাড়া ওর নৃত্য শিক্ষক এবং অর্কেষ্ট্রা পরিচালনার ভার নিয়ে গেল আমার এক গুরুভাই—মিছির সিং।

প্রায় দু'মাস মালবিকা ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ও বড় বড় শহরে নৃত্য প্রদর্শন করে সারা ভারতের নৃত্যরস পিপাসুদের প্রসংসা কুড়িয়ে ফিরে এলো। আমি খুব উৎসাহ নিয়ে ওর প্রশংসাপত্র ও পদকগুলো দেখলাম। আমার মালিনী গুণীজনের এত প্রশংসা পেয়েছে দেখে আমার মনে যে কত আনন্দ হল তার কণামাত্রও যদি বাইরে প্রকাশ করতে পারতাম বাবুজী!

সুরলক্ষ্মীর পরিতুষ্টির জন্য কঠোর সাধনার ভেতর দিয়ে দেখতে দেখতে প্রায় তুটি বছর কেটে গেল। আজকেই আমি গুরুজীর পুঁথিতে উক্ত শেষ রাগটি কণ্ঠে তুলে নেব। তুপুর থেকেই আমার মনে উৎসাহ ও উদ্দীপনার অন্ত নেই। মনে মনে ঠিক করে রাখলাম, নিস্তব্ধ নিশিতে অধিতব্য শেষ রাগের আলাপ ও রেওয়াজ শেষ করে একেবারে হঠাৎই যেয়ে উপস্থিত হবো মালিনীর কক্ষে। পলে অনুপলে সুদীর্ঘ তুটি বছর যার প্রতীক্ষায় কাল গুণে এসেছে, অপ্রত্যাশিত ভাবে সেই আমাকে কাছে পেয়ে আনন্দে আবেশে ও না জানি কি কাণ্ড করে বসে! ভাবতে ভাবতে আমার চোখে আনন্দাশ্রু দেখা দিল।

কিন্তু পরক্ষণেই বিবেকের অঙ্গুলি নির্দ্দেশে সতর্ক হলাম। বিত্যুৎঝলকের মত মনে ভেসে উঠল গুরুজীর রোগপাণ্ডুর মূর্ত্তি। না, এখনও ত এসব ভাববার সময় আসে নি! এখনও ত সাধক-ব্রাহ্মণের পা ছুঁয়ে শপথ করার নির্দ্দিষ্ট কাল শেষ হয় নি। আবার আমি ডুবে গেলাম শিষ্যদের তালিম দেবার কাজে। এই ভাবে দিনের আলো নিভে এলো। প্রহরের পর প্রহর অতিক্রান্ত হয়ে যামিনী নিশুতির কোঠায় এগিয়ে চলল। আমি নৈশাহার শেষ করে তানপুরা ও পুঁথি নিয়ে কার্পেটে আচ্ছাদিত বেদীতে গিয়ে বসলাম। আকাশের গায়ের পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র আমার বারান্দার আলোকে যেন উপহাস করছে। একবার চেয়ে দেখলাম বিশ্বপ্রকৃতির দিকে। বড় সুন্দর লাগল। তু'বছর পর এমন ভাবে চাইলাম প্রকৃতির পানে।

তানপুরার তারে আঙ্গুলের স্পর্শ দিয়ে সরগম অনুসারে গলা সাধা সুরু করলাম। আজ কণ্ঠে তুলতে হবে আমায় দীপক রাগের অনুসঙ্গী একটি অপ্রচলিত রাগ। রাগটি যে বিশেষ কঠিন সে কথা বলাই বাহুল্য। নতুবা গুরুজী এত রাগ রাগিনী থাকতে এইটিকেই তাঁর পুঁথির শেষ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ করতেন না। ঘণ্টা-খানেকের মধ্যেই আমি বাহ্য-জ্ঞান হারিয়ে সুদূর সুরলোকে নিয়ে গেলাম নিজের সকল অনুভূতিকে। আমার দৃষ্টির সম্মুখ থেকে ক্রমে ক্রমে বিলীন হয়ে গেল জগৎসংসার, আকাশের চাঁদ, বাগিচায় বিকশিত পুষ্পরাজির সৌরভ, বাড়ী ঘর। এমনকি তানপুরার অস্তিত্বটাও মুছে গেল দৃষ্টি থেকে। আমার মনে হল যেন চারিদিকে থৈ থৈ করছে শুধু জল আর জল! তারই উপরে আমি সুরের ভেলায় ভাসতে ভাসতে নিরীক্ষণ করছি শুধু রাগরূপ। কতক্ষণ এইরূপ রাগ সাগরের ভেলায় ভেসেছিলাম জানিনা। এক সময় হঠাৎ আমার বুকফাটা ব্যথার আর্তনাদে সুর পালিয়ে গেল কণ্ঠ থেকে! গভীর রাত্রির নৈশনিস্তব্ধতা খান খান করে সে চিৎকার ছড়িয়ে পড়ল দিক হতে দিগন্তে।

অসহ্য যন্ত্রণায় আমি লুটিয়ে পড়ে কাৎরাতে লাগলাম। আর দুহাত দিয়ে চোখ ঘষতে লাগলাম। আমার হাতের চাপে তানপুরার তান কেটে গেল! ছিঁড়ে গেল তার। অনুভব করলাম চোখে মুখে গরম জল—না, জল নয়, গন্ধে বুঝলাম ও কফি। আমি সকল শক্তি দিয়ে চোখ মেলে চাইতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু আমার চোখের সামনে ততক্ষণে নেমে এসেছে ঘন কালো যবনিকা, যা পৃথিবীকে রেখেছে আড়াল করে। দেখতে ইচ্ছা করল আকাশের সুধাবর্ষী চাঁদ, বাগিচার শুচিশুভ্র রজনীগন্ধা। দেখতে ইচ্ছা করল বিশ্ব-

প্রকৃতির সব কিছু! কিন্তু বিফল হলাম। সেই সঙ্গে আমার চোখে মুখে অসহ্য বেদনা অনুভব করলাম। প্রবল যন্ত্রণায় আমি বেদির উপরে দাপাদাপি করতে লাগলাম। ততক্ষণে দূরে ছিটকে পড়েছে তানপুরা, ছৈছত্রাকার হয়ে পড়েছে গুরুজীর পুঁথিপত্র।

কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই সারা বাড়ী জেগে উঠল। শঙ্কর প্রসাদ আমাদের বাড়ীতেই থাকত। সে প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের সঙ্গে ফিটনে করে আমায় নিয়ে চলল হাসপাতালে। বিশেষ নাম করা আই স্পেশালিষ্ট কেউ ছিল না বেনারসের হাসপাতালে। তবু সার্জ্জেন যিনি ছিলেন, তিনিই যত্ন সহকারে আমার প্রাথমিক চিকিৎসা করলেন। প্রয়োজনীয় অষুধপত্র দিয়ে, মুখে চোখে আমার ব্যাণ্ডেজ করে দেওয়া হল। ডাক্তাররা পরামর্শ দিলেন—পরদিনই আমায় কলকাতা নিয়ে যেতে। মনে মনে বুঝলাম যে চিরজীবনের মত আমি হারিয়েছি মানব জীবনের পরশ-পাথর—আমার দৃষ্টি। সারা তুনি-য়ার রং এক মুহূর্ত্তে আমার কাছে একবর্ণ ধারণ করল বাবুজী—সে হল ঘোর কৃষ্ণবর্ণ।

হাসপাতাল থেকে বাড়ী ফিরতে প্রায় ভোর হয়ে গেল। শঙ্করের হাত ধরে গাড়ী থেকে নামতে নামতে শুনতে পেলাম দাস-দাসীরা সমবেত স্বরে কান্নাকাটি করছে। তাদের কান্না ছাপিয়ে অনসূয়া ও প্রিয়ংবদার বিলাপ কানে এলো! আমি গাড়ী থেকে নেমেই সাগ্রহে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানলাম যে, আমায় হাসপাতালে নিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই মালিনী সেই যে ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করেছে—শত অনুনয় বিনয়েও সে দোর খুলছে না। বিপদের ওপর বিপদ! বিপদ নাকি একা আবির্ভূত হয় না। শঙ্করের হাত ধরে অন্ধত্বের অনভ্যস্ততার

মধ্যেও যত দ্রুত সম্ভব মালিনীর ঘরের দরজার কাছে এসে তার নাম ধরে আকুলভাবে ডাকতে লাগলাম। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। অভিমানিনীর সাড়া মিলল না বাবুজী। শঙ্কর প্রসাদ দরজা ভেঙ্গে ফেলবার জন্য অনুমতি চাইল। এছাড়া আর অন্য উপায় ছিল না। কি এক ঘনঘোর অমঙ্গল আশঙ্কায় আমার সারামন কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল।

শাবল দিয়ে আঘাতের পর আঘাত হেনে মালিনীর ঘরের দরজা ভাঙ্গা হল। দরজা ঠেলে হুড়মুড় করে ওরা সবাই একসঙ্গে ঘরে ঢুকেই ভীতবিহ্বল কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল! ডুকরে কেঁদে উঠল অনসূয়া আর প্রিয়ংবদা। দৃষ্টিহীন আমি সকলের হাত ধরে অনুনয় করতে লাগলাম—ওরে বল, তোরা বল আমার মালিনীর কি হয়েছে!

অবশেষে শুনলাম বাবুজী, মালিনী আত্মহত্যা করে সব জাগতিক জ্বালা জুড়িয়েছে। কড়ি-কাঠ থেকে ঝুলছে ওর প্রাণহীন নিস্পন্দ নিথর দেহ। শোনামাত্রই আমি সঙ্গা হারিয়ে পড়ে গেলাম!

আমার জ্ঞান ফিরে এলে দারোগা সাহেব নানাবিধ প্রশ্ন করে জানতে চাইলেন মালিনীর মৃত্যুর কোন কারণ আমি জানি কিনা। আমি বললাম, যদি কেউ সে কারণ জেনে থাকেন, জানেন শুধু অন্তর্য্যামী। শুনলাম মালিনী চিঠি লিখে গেছে:

—আমার মৃত্যুর জন্য আমি ছাড়া আর কেউই দায়ী নয়।

—আচ্ছা বাবুজী; এতবড় মিথ্যা কথাটা লিখতে মালিনীর হাত একটুও কাঁপল না?

—আপনার কি মনে হয় ওঁর মৃত্যুর জন্য অন্য কেউ দায়ী?

আমি প্রশ্ন করলাম।

—অন্য কেউ নয় বাবুজী, অন্য কেউ নয়। ওঁর মৃত্যুর জন্য একমাত্র দায়ী হলাম এই আমি, আমি, আমি।

বলতে বলতে তিনবার শার্ঙ্গদেব আঙ্গুল দিয়ে নিজের বক্ষদেশ নির্দেশ করলেন।

—এ আপনার মনের ভুলও ত হতে পারে।

—ভুল? ভুল হবে কেন, এই হল সবচেয়ে সত্য।

মালিনীর মৃত্যুর দিন থেকে বাবুজী, আমার শিল্পী জীবনে অশৌচ পালন করছি। আমোদ প্রমোদের সঙ্গে আমার চির-বিচ্ছেদ সুরু হয়েছে। লোকে আমাকে যত বড় কলাকারই ভাবুক, আমি ত জানি, আমার প্রথম প্রকাশ্য প্রতিষ্ঠা লাভ হয় কলকাতার সঙ্গীত সম্মেলনে। আর সে সম্মেলনে গাইবার আগে যদি মালিনীর মধুর হাসিতে অনুপ্রাণিত না হতাম তবে আমি এতটা সফল হতে পারতাম না। অনেকে বলে আমি কেন সব ছেড়ে দিয়েছি, এমন দুর্লভ শিল্প-প্রতিভা কেন হেলায় হারাচ্ছি। কিন্তু বাবুজী, আমি ত জানি প্রেরণা ছাড়া কোন শিল্পীই বড় হতে পারে না। মালিনী চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই যে আমি সে প্রেরণা হারিয়েছি!

শার্ঙ্গদেবের চোখ দিয়ে এই ক'ঘণ্টা সময়ে কতবার যে জল ঝরেছে তার হিসেব আমি রাখিনি। তার কাহিনী বলা শেষ হলে আমি হতাশ কণ্ঠে বললাম:

—ওস্তাদজী, আপনার কাহিনীর এখানেই ত শেষ হতে পারে না!

—কেন বাবুজী?

—মালবিকা দেবী যে এ কাহিনীর অর্দ্ধেকটা জুড়ে আছেন—তাঁর সম্পর্কে সব না জানা পর্য্যন্ত এ কাহিনী কিছুতেই যে সম্পূর্ণ হতে পারে না। যে কৌতূহল নিয়ে আমি সুদূর কলকাতা থেকে ছুটে এসেছি, কৈ তা ত মিটল না। তাজমহলের প্রেমের পাষাণ স্মৃতির তলে যে দুটি প্রাণ ঘুমিয়ে আছে, একটি তার শাজাহান সত্য কিন্তু আর একটি যে মমতাজবিবি!

—কিন্তু তা কেমন করে, কোথা থেকে জানব বাবুজী?

—কেন, ওঁর জিনিষপত্র কি আপনার শ্বশুরমশায়ের হেফাজতে?

—না, তিনি নিতে এসেছিলেন—আমি নিতে দিইনি।

গম্ভীর কণ্ঠে বলেন শার্ঙ্গদেব।

এ নিয়ে আমাদের মধ্যে মতান্তর হয়। অবশ্য আমি তাঁর দোষ দিই না। তাঁর মত স্নেহশীল পিতার পক্ষে একমাত্র সন্তানের বিয়োগ-ব্যথা যে কি, তা অন্ততঃ আমি কিছুটা বুঝতে পারি। কিন্তু বাবুজী, মালিনীর সব স্মৃতি-সামগ্রী দিয়ে দিলে আমি কি নিয়ে থাকব, এ কথাটা উনি ভেবে দেখলেন না! আর ভাববেনই বা কি করে, কিছুদিন পরই ত মাথা খারাপের মত হয়ে গেলেন। ওঁর সঙ্গেই অনসূয়া, প্রিয়ংবদা চলে গেল। আমি মালিনীর ঘরে ওর সব জিনিষপত্র রেখে তালা দিয়ে রেখেছি। প্রতিদিন সন্ধ্যায় ও ঘরে আমি নিজে ধূপধুনো দিই। ওর সব জিনিষপত্র স্পর্শ করে ওকে যেন আমি নিবিড় করে পাই আমার হৃদয়ের ফাঁকা স্থানটায়।

—আচ্ছা, আপনি কি ওর বাক্সপত্র খুঁজে দেখেছেন, এমন কোন চিঠিপত্র বা ডায়রী গোছের কিছু পাওয়া যায় কিনা, যা থেকে ওঁর তখনকার মানসিক অবস্থা জানতে পারি?

—দেখুন বাবুজী, যেদিন আমি ওঁকে হারিয়েছি, সেদিনই

হারিয়েছি আমার দৃষ্টি, তাই ওসব খুঁজে দেখার ইচ্ছা থাকলেও উপায় ছিল না।

—আপনার যদি আপত্তি না থাকে, আমি একবার ওঁর বাক্সপত্র খুঁজে দেখতে চাই। দেখতে চাই এমন কোন সূত্র পাওয়া যায় কিনা, যা থেকে যে কাহিনী আপনি সুরু করেছেন, তার শেষ খুঁজে পাওয়া যায়।

—বেশ, আজকে দুপুরে না হয় বাক্সপত্রগুলো খুঁজে দেখা যাবে বাবুজী।

কথা শেষ করে এক গভীর তপ্ত দীর্ঘশ্বাস ফেললেন শার্ঙ্গদেব।

মধ্যাহ্ন আহার সেরে বিশ্রামাদির পর আমায় নিয়ে শার্ঙ্গদেব মালবিকার ঘরে ঢুকলেন। ঘরে ঢোকামাত্রই আমার মনে হল, এক যুবতী বধূর বুভুক্ষিত অশরীরি আত্মার উপস্থিতি বুঝি এ ঘরে এখনও তেমন করে সন্ধান করলে খুঁজে পাওয়া যাবে। একটা অতৃপ্ত ইচ্ছা যেন এই ঘরের মেঝেয় মাথাকুটে মরছে। আমি আগ্রহের সঙ্গে ঘরটার চারিদিকে চাইতে লাগলাম। দেখলাম, পালঙ্কের উপরে পরিপাটি করে দু'জনের উপযোগী বিছানা পাতা রয়েছে। তাতে পাশাপাশি দু'জোড়া বালিশ।

শার্ঙ্গদেব বললেন :

—বাবুজী, খাটের উপরে বিছানা পাতা দেখছেন ?

—হ্যাঁ, ওস্তাদজী।

—ঠিক ঐভাবে ঐ বিছানা পেতেছিল আমার মালিনী—যেদিন ওঁর প্রথম পদক্ষেপে এ বাড়ী ধন্য হয়, সেইদিন। সারাদিন ধরে প্রতীক্ষা করেছিল ও আমাদের ব্যর্থ ফুলশয্যা পুষ্পপত্র ছাড়াই মনের মাধুরী দিয়ে রচনা করবে বলে। কিন্তু দিনের শেষে আমি যখন পাশের ঘরে শোবার প্রস্তাব করলাম—ও একা আর কোনদিন শোয়নি ও পালঙ্কে। জীবন বলি দেবার দিনটি পর্য্যন্ত কত যত্নে ও ঐ বিছানা প্রতিদিন ঝেড়ে মুছে ঝকঝকে তকতকে করে রাখতো। অনসূয়ার মুখে সব শুনেছি আমি, বাবুজী, সব শুনেছি।

ব্যথাকরুণ কণ্ঠে বলেন শার্ঙ্গদেব।

একটু থেমে শার্ঙ্গদেব বিছানার কাছাকাছি গিয়ে আবার বললেন :

—বাবুজী, বালিশের উপরে দু'টো ঢাকনা পাতা রয়েছে ?

—হ্যাঁ, ছুটোতেই লেখা আছে 'ভালবাসা'।

—ও ছুটোতে কাজ করে দিয়েছে অনসূয়া আর প্রিয়ংবদা।

কিসের কৌতূহলে জানি না, আমি বারবার কক্ষের চারদিকে ইতস্তত শুধু চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলাম। বোধ হয় অনুভব করতে চাইলাম স্বামীউপেক্ষিতা এক মিলন-বুভুক্ষু নারীর দীর্ঘশ্বাস। কিছুক্ষণ পর শার্ঙ্গদেব হাতের চাবির গোছাটা আমার দিকে বাড়িয়ে ধরে বললেন ঃ

—এই নিন বাবুজী, মালিনীর চাবি। এ ঘরের সবগুলো ট্রাঙ্ক স্যুটকেশই ওঁর। এতেই আছে সব চাবি।

চাবি নিয়ে ঘরের একপাশে পর পর সাজানো ট্রাঙ্কগুলো খুলে যেতে লাগলাম একের পর এক। তাতে অন্বেষণ করতে লাগলাম মালবিকার না-বলা কথার কোন অভিজ্ঞান পাওয়া যায় কিনা।

—বাবুজি! অনসূয়া বলেছিল ঐ ট্রাঙ্কগুলোর উপরে উঠেই মালিনী কড়ি কাঠ থেকে ঝুলানো ফাঁস গলায় পরেছিল। এক একদিন মনে হয় আমার, ঐ ট্রাঙ্কগুলো ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিই। কিন্তু পরক্ষণেই ভেবে দেখি, তাতে ওর স্মৃতিই ধ্বংস করা হবে। যে চলে গেছে এ পৃথিবী থেকে, সে ত আর ফিরে আসবে না। যারা যায় তারা যে আর কখনও ফিরে আসে না, বাবুজী।

আমি ভাল করে চেয়ে দেখলাম ট্রাঙ্কগুলোর উপরে। মনে মনে ভাবলাম, আতস কাঁচ দিয়ে দেখলে হয়তো সবার প্রথমের ট্রাঙ্কটার উপর এখনও একজোড়া সুঠাম সুশ্রী চরণচিহ্ন পাওয়া যাবে।

এবার কাজে লেগে গেলাম। কয়েকটা ট্রাঙ্কের পকেটে অনেক-গুলি চিঠিপত্র পেলাম। পড়লামও সব, কিন্তু তাতে কোন সূত্রের সন্ধান পেলাম না। সব চিঠিই মালবিকাকে লেখা—মিঃ রায়ের

বা ওর বান্ধবীদের। এ থেকে আর কিইবা পাব। আবার আর একটা ট্রাঙ্ক খুললাম। এ ট্রাঙ্কটা ভর্ত্তি কাগজপত্র। অনেকগুলি খাতায় নানা নৃত্যের পরিচয়। প্রবল আগ্রহে পরশ-পাথর খোঁজার মত করে আমি প্রতিটি খাতার আদ্যপ্রান্ত দেখতে লাগলাম। অনেকগুলো খাতাপত্রের নীচে একটা বেশ মোটা বাঁধান খাতা পেলাম। এ খাতাটার মলাট খুলেই আমি আর্কিমেডিসের মর্ত উল্লাস নিয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম :

—পেয়েছি ! পেয়েছি ওস্তাদজী !

—পেয়েছেন, পেয়েছেন বাবুজী ! কই, দেখি, দেখি, দেখি ?

পরম আগ্রহে হাত বাড়িয়ে খাতাটার অস্তিত্ব অনুভব করতে চেয়ে আবার বললেন শার্ঙ্গদেব :

—চিঠি না ডায়রী বাবুজী ?

—ডায়রী।

সাগ্রহে আমার কাছে আরও এগিয়ে বসলেন শার্ঙ্গদেব। আমার হাত থেকে খাতাটা নিয়ে শিশুর কোমল অঙ্গে হাত বুলাবার মত করে তাতে হাত বুলালেন। তারপর আমার দিকে সেটা বাড়িয়ে দিয়ে প্রাণের নিভৃতের আকুতি মিশিয়ে বললেন :

—বাবুজী, আর দেরী নয়, পড়ুন, আমি শুনি।

—কিন্তু বাক্সগুলো যে অগুছালো হয়ে পড়ে রইলো।

—থাক থাক বাবুজী, ওসব পরে হবে।

—শুনুন তবে।

—পড়ুন বাবুজী।

আমি ডায়রীর খাতাটা খুলে একবার আদ্যপ্রান্ত উল্টেপাল্টে

দেখে নিলাম। একেবারে শেষের পৃষ্ঠায় কোণাকুণি করে লেখা রয়েছে ঃ

ডায়রী বা রোজনামচা বলতে যা বুঝায়—আমার এ খাতা ঠিক সেভাবে লেখা হয়নি। হঠাৎই একদিন এটা লিখতে সুরু করি আমি। স্বামীর নিতান্ত উপেক্ষায় মাঝে মাঝে আমি আমার মনটা হাতড়ে দেখতাম। সেইভাবে দেখতে দেখতেই একদিন এটা লিখতে সুরু করি। তাই এ ডায়রীর বেশীর ভাগ অংশ জুড়ে আছে আমার জীবনের শেষ দু'টি বছরের হাসি-কান্নার কথা।

—মালবিকা চৌধুরী—

বসন্ত পূর্ণিমা ঃ ১৩৫৭

—বাবুজী, ঠিক ঐদিনই আমার দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছি আর ঐদিনই হারিয়েছি মালিনীকে—আমার দৃষ্টির সবচেয়ে প্রিয় দ্রষ্টব্য। দৃষ্টি হারিয়ে একদিক দিয়ে ভালই হয়েছে, তাই না বাবুজী? যে দৃষ্টি দিয়ে আমার মালিনীকে আর কোনদিন দেখতে পাব না; সে দৃষ্টি থাকা না থাকা ত সমানই।

শার্ঙ্গদেবর কথা ঠিক কান্নার মত শোনায়। তিনি থামলে আমি মালবিকার ডায়রী পড়তে সুরু করি ঃ

—ছোট্ট একটি মেয়ে। শৈশব থেকেই সে মাতৃহীনা। শুধু মা-ই নয়, ভাই বোন আত্মীয়স্বজন বলতে কাউকেই দেখে নি সে। মেয়েটি বড় হতে থাকে। দুধে আলতায় মেশান রং, সুন্দর মুখশ্রী, টানা ডাগর চোখ। চোখে নাকি কি এক স্বপ্নমায়া। লোকে বলত কোন দেবকন্যা যেন পথ ভুলে এ ধরণীতে নেমে এসেছে। বাবাই একাধারে মায়ের স্নেহ পিতার কর্তব্য দিয়ে বড় করে

তুলেছেন ওকে। আর যাঁর স্নেহ পেয়েছে ও, তিনি হলেন ঠাকুমা। ছোটবেলায় ঠাকুমাকেই মেয়েটি মা বলে ডাকতো। দু'জন আয়া দিনরাত আগলে থাকত মেয়েটিকে। তাদের কাছ থেকে বার বার মন ছুটে যেত ওর ঠাকুমার কাছে, তাঁর পূজোর ঘরে। ঠাকুমাকে বড় ভাল লাগত মেয়েটির। ওকে বুকে নিয়ে বসে কত গল্প শোনাতেন—রাজা, রাজপুত্র, রাজকন্যা, কোটালপুত্র, ব্যাঙ্গমা, ব্যাঙ্গমী—আরো কত কী।

ধীরে ধীরে মেয়েটি বড় হয়ে উঠল। বাড়ীর সামনের বাগানে ফ্রক উড়িয়ে ফুরফুরে হাওয়ার মত ঘুরে বেড়াত সে। ছোটবেলায় এক মেমসাহেব ওকে পড়াতেন। তারপর কিছুটা বড় হলে লরেটোয় ভর্ত্তি করে দিলেন ওকে ওর বাবা। একের পর এক ক্লাস ডিঙোতে লাগলো সে। তখন কি চঞ্চলই না ছিল মেয়েটি! পড়াশুনায় ও ভাল ছিল ক্লাসে। মিষ্ট্রেসরা ওর খুব প্রশংসা করতেন।

সেবার ওদের স্কুলের সোশ্যাল দেখতে ও ওর বাবাকে নিয়ে গেল। ওর নাচের খুব প্রশংসা পেল চারদিক থেকে। বাড়ী এসে মেয়েটি ওর বাবাকে জানাল যে, নাচ শিখতে ওর ভারি ইচ্ছে। ওর কোন ইচ্ছায়ই বাবা কখনও বাদ সাধেন নি। এক কথায় রাজী হয়ে গেলেন। পরদিনই খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেন নাচের মাষ্টার চেয়ে।

নির্দ্ধারিত সময়ে ক'জন প্রার্থী এলেন। সমস্যা দেখা দিল, কি করে শিক্ষকদের যোগ্যতা পরীক্ষা করা হবে। অবশেষে ওর বাবা একটা বুদ্ধি বাতলে দিলেন। ঠিক হল, যে শিক্ষক দশ মিনিটের মধ্যে মেয়েটিকে একটা নাচ শিখিয়ে দিতে পারবেন, তাঁকেই নিযুক্ত করা হবে। ওর বাবা অবশ্য প্রার্থীদের একথা জানালেন না।

অবশেষে মেয়েটি একে একে পাঁচজন শিক্ষকের কাছে পাঁচটা নাচ শিখে নিল। নাচ শিখিয়েই চলে গেলেন নৃত্যশিক্ষকরা। মেয়েটি পরে এক এক করে নাচগুলো নেচে দেখাল ওর বাবাকে। তার মধ্যে যে নাচটা ওর বাবার দৃষ্টিতে 'পারফেক্ট' মনে হল—সেই নাচের মাষ্টারকেই নিযুক্ত করা হলো। দিনের পর দিন মেয়েটি নাচের সাধনায় নিয়োজিত রাখলো নিজেকে।

ও যখন ক্লাস সেভেনে পড়ে তখনই ওদের বাড়ীতে এলো অনসূয়া আর প্রিয়ংবদা। যমজ বোন ওরা। একসঙ্গে যেমন ওদের জন্ম, এক সঙ্গেই ওদের বিয়ে হয়--আবার কয়েকদিনের আগে পিছে ঐ কিশোরী দুটি বিধবাও হয়। ওরা হল মেয়েটির ঠাকুমার এক দূরসম্পর্কের ভাইপোর মেয়ে। বিধবা হবার পর শ্বশুরবাড়ীর লোকেরা ওদের ওপর নির্য্যাতন করায় ওদের নিয়ে আসা হয়। তারপর থেকে ওদেরও স্কুলে ভর্ত্তি করে দেওয়া হল। আর ওরাও মেয়েটির সঙ্গে নাচ শিখতে লাগল।

কিছুদিনের মধ্যেই ওরা তিনজন পরম সহচরী হয়ে উঠল। মেয়েটির বাবা বলতেন ওরা তিনটি যেন এক থোকার তিনটি ফুল। ওদের পরস্পরের মধ্যে যেমন ভাব ছিল ; আবার তেমনি ঝগড়াও কম ছিল না। ওদের সঙ্গে ঝগড়া হলেই মেয়েটি ছুটে গিয়ে বাবার কাছে নালিশ করতো। বাবা হেসে কোলে টেনে বলতেন ঃ

—ওরা দেখি তোর শত্রুই রয়ে গেল !

সেই থেকে ওরা দু'জনে মেয়েটির শত্রু হয়েই রয়েছে।

মেয়েটি যখন ক্লাস এইটে পড়ে, তখন ওর দেহে বিকশিত হয়ে উঠতে লাগল যৌবনের লক্ষণগুলি। কৈশোর আর যৌবনের সন্ধিক্ষণে কি দুষ্টুই না ছিল মেয়েটি। যৌবনের সকল তথ্য সম্পর্কে পাঠ নেয়

ও অনস্য়ার কাছ থেকে। অনস্য়া বরাবরই প্রগল্‌ভা।

সেবার ও যখন ক্লাস নাইনে পড়ে—একদিন ও আড়াল থেকে ঠাকুমা ও বাবার কথোপকথন শুনেছিল। ঠাকুমার প্রবল আপত্তি মেয়েটির নাচ শেখায়। তিনি বলতে চান যে, এপথে নামলে চরিত্র ঠিক থাকে না। ওর বাবা কিন্তু সে কথায় কিছুতেই কান দিলেন না। তাঁর মত হল এই যে, চরিত্র রক্ষা করতে জানলে যে কোন পরিবেশেই রক্ষা করা যায়।

ম্যাট্রিক পাশ করার পর মেয়েটি ভর্ত্তি হল স্কটিশ চার্চ কলেজে। তখন দেহ-মনে তার যৌবন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দৃষ্টিতে তার জগতের রং হয়েছে মধুময়। কত মধুলোভী ভ্রমরের মত তরুণরা তাকে ঘিরে গুঞ্জন তুলল। কিন্তু একটা আভিজাত্যের আবরণে সে নিজেকে রক্ষা করে চলত বরাবর। সব সময়েই তার মনে ভেসে উঠত লুকিয়ে শোনা ঠাকুমার সাবধান বাণী।

এই বছরই ইণ্টার ইউনিভার্সিটি ড্যান্সিং কম্পিটিশনে মেয়েটি বিশেষ পারদর্শিতা দেখায়। খবরের কাগজের অনেকটা জায়গা জুড়ে ছাপা হয় ওর ছবি, নিউজ। সেই থেকে ওর বাবা বিশেষ অনুপ্রাণীত হয়ে দু'তিনজন বিখ্যাত নৃত্য-শিল্পীকে ওর নাচের শিক্ষকরূপে নিযুক্ত করেন।

ইতিমধ্যে ওর ঠাকুমা কঠিন অসুখে পড়লেন। ডাক্তাররা ঘন ঘন যাতায়াত সুরু করলেন। মেয়েটির একমাত্র আত্মীয়া তিনি; তিনি চলে যাবেন—এ ব্যথার আশঙ্কা বড় ব্যাকুল করে তুলল ছোট মনটাকে তার। কলেজ কামাই করে রাতদিন শিয়রে বসে থাকে সে রুগ্না ঠাকুমার। রামায়ণ পাঠ করে শোনায়, শোনায় মহাভারত। একদিন মেয়েটি ঠাকুমাকে এক অদ্ভুত প্রশ্ন করে বসে:

—আচ্ছা ঠাকুমা, কার আদর্শ ভাল, সীতার না সুভদ্রার ?

—সে কি বলা যায় দিদি, ওঁরা হলেন দেবী-দুর্লভ চরিত্র। ওদের যাঁকে আদর্শ ভাববে, জীবন সার্থক হবে। আমার মতে সুভদ্রার চরিত্রটিরই গুরুত্ব বেশী। হাজার ঝড় ঝাপটায়ও কেমন স্থির, অচঞ্চল।

একটু চুপ করে থেকে ঠাকুমা শুধান :

—হঠাৎ এ প্রশ্ন কেনরে দিদি ?

—না, এমনি।

মেয়েটি আনত মুখে বলে।

কয়েকদিনের রোগভোগের পরেই ঠাকুমা মারা গেলেন। মৃত্যুপথ যাত্রিনী ঠাকুমার উদ্দেশ্যে মেয়েটি মনে মনে শপথ নিল :

—তাই হবে, সুভদ্রাকেই আদর্শ বলে মেনে নেব, ঠাকুমা।

ইতিমধ্যে মেয়েটির নাচের খ্যাতি দিনের পর দিন বেড়েই চলে। যতদিন যায় ততই বেড়ে চলে নানা নৃত্য-নাট্যের পোষাকপত্রও। অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা সর্ব্বদা ওর সঙ্গে থাকে যেন ছায়ার মত ! ওদের সখীত্ব দিনের দিন যেন আরও গভীর হতে থাকে।

ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় পাশ করবার পর মেয়েটির বাবা অনসূয়া আর প্রিয়ংবদাকে দিয়ে ওর কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠালেন। ও আপত্তি জানিয়ে বলল :

—তাড়া কেন সখী, দুষ্মন্তর আগমন হক।

অবশেষে কি ও দেখা পেল দুষ্মন্তের ?

নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলনের প্রথম দিনের অধিবেশনে নৃত্য পরিবেশনের আহ্বান পেয়েছে ও। এতবড় অনুষ্ঠানে ইতিপূর্ব্বে ও অংশ গ্রহণ করেনি। মনে যতখানি উৎসাহ ছিল, উৎকণ্ঠাও তার চেয়ে কম ছিল না। সারা ভারতের সঙ্গীত ও নৃত্য-জগতের জ্ঞানী ও গুণীদের সমাবেশ হবে এখানে। যথাসময়ে অনুষ্ঠান সুরু হল ওর। অডিটরিয়ামের দর্শকবৃন্দ ওর প্রথম দর্শনেই বিমোহিত হল। নাচ সুরু হতেই ঘনঘন করতালির অভিনন্দন পড়তে লাগল। কিন্তু মেয়েটি বিমোহিত হল মদন-

মোহন রূপ, বয়সে পঞ্চবিংশতি বর্ষীয়, যুবক বেশ, শান্ত, গম্ভীর, অথচ হাস্যোজ্জ্বল আনন, আয়তনেত্র, উন্নত নাসা, গৌর বর্ণের এক যুবককে দেখে। যুবক বসেছিল দ্বিতীয় সারিতে। নৃত্যের সুরুতেই মেয়েটির দৃষ্টি পড়েছিল যুবকের উপর, হঠাৎ একবার চার চক্ষুর মিলন হতেই ওর নাচে ছন্দপতন হবার উপক্রম হল! কিছুতেই মেয়েটি দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে পারছিল না। এ বিমূঢ় অবস্থা থেকে যুবকই মুক্তি দিল তাকে। হঠাৎ সে তার দৃষ্টি আনত করল। আবার নব-ছন্দমায় নেচে চল্‌ল মেয়েটি। আরও মোহনীয় হয়ে উঠল তার নৃত্য। দীর্ঘস্থায়ী করতালির মধ্যে মেয়েটি নাচ শেষ করল। কয়েকটি পদক ঘোষিত হল তার নামে।

মেয়েটি মেক আপ উঠিয়ে যখন অডিটরিয়ামে এলো, সেই নব্য যুবক ওকে একটি গোলাপ উপহার দিয়ে তার নাচের ভূয়সী প্রশংসা জানাল। মেয়েটির মনে ঐ যুবকের পরিচয় জানবার জন্য উদগ্র কৌতূহল থাকা সত্বেও কি এক সংকোচে কিছু জিজ্ঞেস করতে পারলো না। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই তার পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়ল। সে একজন তরুণ মার্গ সঙ্গীত শিল্পী। সেই অধিবেশনেই সঙ্গীতের সুরলহরীতে সেও শ্রোতাদের মনের তারে ঘা দিয়ে প্রশংসা আদায় করে নিল। মেয়েটি আনন্দের আবেগে ছুটে গিয়ে তার কণ্ঠের কুসুম-হার পরিয়ে দিল বিজয়ী তরুণের কণ্ঠে। আহ্বান জানাল তাকে তাদের আতিথ্য গ্রহণ করতে।

মেয়েটির বাবা কন্যার ইচ্ছায় কখনও বাদ সাধেননি। তিনিও তরুণকে আমন্ত্রণ জানালেন।

রূপবান, স্বাস্থ্যবান তরুণ অতিথিকে দেখেই প্রগল্‌ভা অনসূয়া মেয়েটির কানে কানে জিজ্ঞেস করল ঃ

—কি রে সখী, এই কি তোর দুষ্মন্ত নাকি? আমায় দিয়ে বলে পাঠাবি নাকি—

যাও সখী, বল তারে
সে যেন ভোলেনা মোরে!

—যাঃ!

বলে মেয়েটি অনসূয়ার গায়ে আলাতো একটা চড়ের স্পর্শ দিল।

সেদিন অনসূয়া নিরস্ত হলেও যুবকের সঙ্গে পরিচয় হবার পর নিরস্ত হতে চাইল না। মেয়েটির মনের মাঝে তখন এক স্বপ্ন পরিবেশ। যা কিছু শোনে সঙ্গীত হয়ে হৃদয়ে পশে, যা কিছু দেখে ফুল হয়ে বিকশিত হয়ে ওঠে। মেয়েটির মনের কাননে যেন আঠারটি বসন্তের সঞ্চিত অযুত পুষ্পমুকুল বিকশিত হয়ে উঠল থরেথরে। শাখায় শাখায় কোকিলের কূজন। সারা মন তার এক আশ্চর্য্যসুন্দর ভাবে বিভোর হয়ে উঠল। মেয়েরা যাকে মন দেয় তার জন্য যে কোন বাধা বিপদ মাথা পেতে নিতে পারে। মনে মনে মেয়েটি যাকে তার প্রেমাস্পদ ভেবেছে তাকে নিয়ে সে যে কি করবে, ভেবে যেন ঠিক করতে পারে না কিছু। নানা ভাবে চেষ্টা করে তার পাশে পাশে, কাছে কাছে থাকতে। নানা অছিলায় তার মন ছুটে যায় একটা নির্দিষ্ট কক্ষে। পরদিনই মেয়েটি বুঝতে পারল যে, সে যাকে মন দিয়েছে—সেও মন দিয়েছে তাকে। মেয়েরা এটা পুরুষদের চেয়ে সহজে বুঝতে পারে। সেও পারল।

অবশেষে ওর প্রেমাস্পদের সঙ্গে ওর সুরু হল পূর্ব্বরাগের পালা। নানা পরিবেশে চল্‌ল ওদের মন দেওয়া নেওয়া খেলা।

প্রথমদিন মেয়েটি ওর জীবন-নায়কের সঙ্গে কিছু সময় বাগানে অতিবাহিত করে এসেই দেখল ওর নৃত্যশিক্ষক এসেছেন। আজ

তাকে নৃত্যের মাধ্যমে মেঘদূতের বিরহ যক্ষপ্রিয়াকে মূর্ত্ত করে তুলতে হবে। মেয়েটি এ নৃত্যে কিছুতেই মন বসাতে পারে না। বার বার ভুল হয়ে যায় ছন্দ। কেটে যায় তাল। শিক্ষকের তিরস্কারে সে কান্নায় উচ্ছ্বসিত হয়ে ছুটে পালায়। অনসূয়া ওর ঘরে এসে বলে ঃ

—তুমি একেবারেই মরেছো হতভাগী! এসো, ও নাচ আর নাচতে হবে না। বসন্ত-বন্দনাই নাচবে চল।

কিন্তু এভাবে লুকোচুরি করে মন দেওয়া-নেওয়ার খেলা চালাতে মেয়েটির মনে শঙ্কা জাগে। বারবার মনে পড়ে ঠাকুমার সাবধান বাণী। শত্রুদের শরণাপন্ন হয়ে ওর বাবার গোচরে আনে এ কথা।

মেয়েরা প্রকৃত ভালবাসার মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য নিরুদ্বেগে প্রাণপাত করতে পারে। মেয়েটি উপযাচিকা হয়ে ছেলেটিকে উদ্বুদ্ধ করে ওর বাবার কাছে পাঠায়। ওর বাবা প্রায় রাজী হয়ে যান। ছেলেটির বংশ পরিচয় ও সাংসারিক খোঁজ-খবর নিয়ে এসে ওর বাবা জানান যে, ছেলেটি বিশেষ শিক্ষিত। এ্যাকাডেমিক ক্যারিয়ার তার খুবই ভাল, তা ছাড়া সচ্ছল অবস্থা এবং সম্ভ্রান্তও বটে।

ধুমধামের সংগে ওদের বিয়ে হয়ে যায়। সারাবাড়ী আনন্দে উতরোল। বিয়ের পরেই এলো ফুলশয্যার রোমাঞ্চিত রাত্রি। কত উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে মেয়েটির বান্ধবীরা ফুলসাজে সজ্জিত করল একটি কক্ষ, তার পালঙ্ক। কুসুম শয্যায় বসে যখন নবপরিণীত বর ও বধূ মন বিনিময়ে স্বর্গ রচনায় উদ্যত, তখনই কালান্তক শমনের মত এলো এক টেলিগ্রাম। টেলিগ্রাম পেয়েই স্বামী যেন তার মুহূর্ত্তে অন্য মানুষ হয়ে গেল! মেয়েটি লুটিয়ে পড়ল উচ্ছ্বসিত কান্নায় ফুলশয্যার উপাধানে। নয়নে ঝরে তার অবিরল অশ্রু। তার জীবনের রোমান্স সুরু না হতেই যে শেষ হয়ে গেল! কল্লোলিনী নদী যেন অকস্মাৎ মরু পথে হারাল তার ধারা। স্বামী তার উদ্‌ভ্রান্তের মত পায়চারী করে কাটালো ফুলশয্যার সারাটা রাত। কত কষ্টে যে মেয়েটি বুকের ব্যথা, চোখের জল লুকাল স্বামীর কাছ থেকে, তা ভাষার আখরে কি বর্ণনা করা যায়? এ অবস্থায় যে পড়েনি সে বুঝবে না ওর মর্মবেদনা।

পরদিনই মেয়েটি স্বামীর সঙ্গে রওনা হল শ্বশুর বাড়ী—বেনারসে। ট্রেনের নিভৃত কামরায় সুদীর্ঘ চার শ মাইল পথ দুটি সদ্য বিবাহিত তরুণ তরুণী পাশাপাশি গেল, কিন্তু একটি মিষ্টি মধুর কথাও বিনিময় হল না তাদের মধ্যে। মেয়েটি কতবার ভাবল স্বামীকে সান্ত্বনা দিয়ে কাছে বসায়, মিষ্টি আলাপে প্রশান্তি আনে তার মনে। কিন্তু স্বামীর গম্ভীর উদ্‌ভ্রান্ত মুখের দিকে চেয়ে সব উৎসাহ তার যেন জল হয়ে যায়। এ ব্যথা যে কত কঠিন তা কার কাছে বলবে সে? নিরুদ্ধ সে ব্যথায় বুক ভেঙ্গে যায় ওর। আর নারীর

পক্ষে পুরুষের উপেক্ষা যে কতখানি বেদনাজনক তাই বা কে বুঝবে।

ট্রেন বেনারস পৌঁছামাত্রই যখন ওর স্বামী সাধারণ সৌজন্যের খাতিরেও কোন কথা না বলে মেয়েটিকে ফেলে ছুটল তার গুরুজীর কাছে, তখন মেয়েটির চিৎকার করে কেঁদে উঠতে ইচ্ছা জাগলো। কিন্তু নববধূ সে। পরিবেশের কথা ভেবে সে নিজেকে সংযত রাখলো।

শ্বশুর বাড়ীতে এসে বৃদ্ধ নায়েবের কাছ থেকে সংসারের সব কিছু বুঝে নিল মেয়েটি। কত আশা আকাঙ্ক্ষা ঈপ্সা নিয়ে সে রচনা করল তাদের উভয়ের জন্য শয্যা। মনে মনে ভাবল নাইবা রইলো ফুল, নাইবা রইলো গন্ধসার—শয্যা ত রইল। মনের মাঝে ওরা ফুটিয়ে নেবে ভালবাসার ফুল, ছড়িয়ে নেবে প্রেমের সৌরভ।

কিন্তু তার এ আশাও সফল হল না। আকাঙ্ক্ষা রয়ে গেল উপবাসী। সন্ধ্যার আগ দিয়ে স্বামী তার গৃহে ফিরল মৃত গুরুজীর পিতৃদায় গলায় ঝুলিয়ে। আশাহত হয়েও মেয়েটি নীরবে সহ্য করল সব। সান্ত্বনা দিতে গেল স্বামীকে। স্বামী এমন ভাব দেখাল, যেন ওর তুচ্ছ সান্ত্বনার কোন মূল্য নেই তার কাছে। মর্মাহত হল মেয়েটি। নীরবে চোখের জল গোপন করল সে।

এক এক করে এগারটি দিন কাটল স্বামীর হবিষ্যান্ন খেয়ে। মেয়েটিও বিবাহিত হিন্দুনারীর মর্য্যাদার কথা ভুলল না। স্বামীর কঠোর ব্রতের সমভাগী হয়ে মেঝেয় আঁচল পেতে শুয়ে কাটাল রাতের পর রাত।

শ্রাদ্ধশান্তি চুকে গেলে ও ভাবল, এবার সে আবার পাবে স্বামীকে একান্ত করে। পাবে তাকে নিভৃতে, নিরালায়, একই

শয্যায়—আবার তারা মনের মাধুরী মিশিয়ে ফুলশয্যার মোহ-মাদকতা আনবে পুষ্পবিহীন পালঙ্কে। কিন্তু স্বামীকে আহ্বান জানাতে গিয়ে পেল সে কঠিন উপেক্ষা। বঞ্চিতা নারীকে তিনি জানালেন ভিন্ন শয্যায়ই শোবেন তিনি। এমন কি আলাদা ঘরে। শত প্রশ্ন যেন ঝঙ্কৃত হয়ে উঠল মেয়েটির মনের তারে—কি তার অপরাধ, কেন এমন উপেক্ষা? যদি তাকে ছাড়াই চলে এ সংসারের সব কিছু, তবে কেন তার সঙ্গে খেলল সে মন দেওয়া-নেওয়ার এ ছিনিমিনি খেলা? প্রশ্নের পর প্রশ্নের ঢেউ ওঠে তার মনে। নিরুদ্ধ অভিমানে কোনদিনই আর শুল না সে তাদের সুন্দর শয্যায়। প্রতি রাতে ব্যথার অশ্রুজলে মাথার বালিশ ভেজে। তবু সারাদিন কর্ত্তব্য করে যায় সে সুগভীর নিষ্ঠায়। প্রতিমুহূর্ত্তে তার মনে হয় আজ বুঝি স্বামী তার সঙ্গে হেসে কথা বলবে, আজ বুঝি একান্তে এসে তার তুটি হাত ধরে বুকে টেনে নেবে, আজ বুঝি তাদের অসমাপ্ত ফুলশয্যা আবার উভয়ের প্রেমে-পুষ্পে শোভিত হবে। কিন্তু দিনের পর দিনের প্রতীক্ষাই শুধু বিফল হয়। সকল আশা নির্মূল হয়। নিরুদ্ধ ব্যথা তার অন্তরের অন্ধকারেই গুমরে মরে।

মেয়েটির স্বামীর অভিভাবকসদৃশ মুনিমজী মৃত্যুর পূর্ব্বে সান্ত্বনা দিয়ে বলে গেলেন, সব ঠিক হয়ে যাবে। হয়তো সাময়িক কোন কারণে এমন করছে সে।

অনেকদিন এমনও হয়, সারাদিনে স্বামীর সঙ্গে দেখাই হয় না ওর। সে যেন শত চেষ্টায় তাকে এড়িয়ে চলতে চায়। তা বোঝে মেয়েটি, কিন্তু ভেবে পায় না কেন তার প্রতি এমন ব্যবহার করা হচ্ছে। মেয়েটির কি করে সময় কাটে? সে কি করে বইবে তার ব্যর্থ প্রেমের বোঝা? এক একদিন ভাবে এ বোবা পরিবেশ থেকে

দূরে পালিয়ে যাবে। কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হয়, যদি ঠিক তখনই স্বামী তার অন্বেষণ করে! যদি সে প্রিয় নাম ধরে ডেকে তার ঘরে আসে! এইভাবে তিল তিল করে সে আশার সৌধ রচনা করে প্রতি প্রভাতে। আবার সে সৌধ প্রতি সন্ধ্যায় ভেঙ্গে চৌচির হয়ে যায়।

স্বামী তাকে শত উপেক্ষা করলেও, সে পারে না দিনে অন্তত একবার তার মুখ না দেখে। চোখের তারায় ওর পরমভক্তের দেব-দর্শনের স্পৃহা যেন জ্বলজ্বল করে। প্রতিদিন গভীর রাত্রিতে স্বামী তার ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতিবাহিত করে সুর-সাধনায়। ওর মনে হয় ওই সময়ের এক শতাংশ মাত্র ব্যয় করেও যদি সে তার দিকে চেয়ে দেখত! এই সময়ে স্বামী নিয়মিতভাবে কফি খেতেন। কফি নিয়ে যেত কোন না কোন দাসী। একদিন এই দাসীর কাজই মেয়েটি নিজের হাতে তুলে নিল। তবু ত কিছুক্ষণের জন্য স্বামীকে প্রাণভরে দেখতে পাবে। বুভুক্ষ নয়ন তার তৃপ্ত হবে ; মন হবে শান্ত।

বিবাহিত জীবনেও এককজীবন যাপনের তপস্যায় মেয়েটির জীবনের উপর দিয়ে অতিক্রান্ত হল সুদীর্ঘ তিনটি মাস। অনেকদিন থেকেই তার নাম নৃত্যশিল্পী হিসেবে সারা ভারতে ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে। দু'তিনটি দেশীয় রাজ্য থেকে এবং বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থান থেকেও তার ডাক এসেছে নৃত্যরসিকদের পরিতুষ্ট করবার জন্য। অনুমতি চেয়ে মেয়েটির নৃত্যশিক্ষক ওর স্বামীকে চিঠি দিয়েছেন।

স্বামী নিজেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ওকে যেতে বলল। বোধ হয় ওর সান্নিধ্য থেকে কিছুদিনের মত রেহাই পাওয়া যাবে ভেবেই তিনি মত দিলেন। মেয়েটির মন কিছুতেই দূরে যেতে চাইছিল না—তার এ

মহাতীর্থপুরী থেকে। কিন্তু স্বামীর আদেশ শিরোধার্য্য করে সে যেতে রাজী হল।

কয়েকদিন পরেই কলকাতা থেকে মেয়েটির নৃত্যশিক্ষক এলেন। ছাত্রীকে কয়েকদিন ধরে তিনি মহলা দিয়ে নিলেন। তারপর একদিন ওদের যাত্রার লগ্ন ঘনিয়ে এলো। ওর সঙ্গে চললেন নৃত্যশিক্ষক, অনসূয়া, প্রিয়ংবদা ও অর্কেষ্ট্রা পরিচালনার জন্য স্বামীর এক গুরুভাই।

বাড়ী থেকে বেরোতে যেয়ে বার বার মেয়েটির চোখ সজল হয়ে ওঠে। দু'তিন বার বাথরুমে গিয়ে চোখে মুখে জল দিয়ে এলো—অশ্রু গোপন করতে। সকলে যখন গাড়ীতে উঠে গেছে তখনও মেয়েটির এত দেরী হচ্ছে দেখে স্বামী নিজেই তাকে ডাকতে এলেন দ্বিতলে। স্বামীকে কাছে পেয়ে মেয়েটি গলায় আঁচল জড়িয়ে প্রণাম করল। মুখ তুলে স্বামীর দিকে চেয়ে বলল ঃ

—আশীর্ব্বাদ করলে না ?

স্বামী কোন উত্তর না দিয়ে শূন্যের দিকে চেয়ে রইলেন।

দুরন্ত অভিমানে মেয়েটির অন্তর ফুলে উঠল। রাগত ভঙ্গিতে গাত্রোত্থান করে সে ছুটে গিয়ে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিতে দিতে বলল ঃ

—আমি এ বাড়ী ছেড়ে কোথাও যাব না, যাব না, যাব না !

স্বামী বোধ হয় প্রমাদ গণলেন। কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই কপাটে মৃদু করাঘাত শুনল মেয়েটি ! তারপর তার বহুবাঞ্ছিত স্বামীর স্নেহমাখা স্বর শ্রবণে পশল ঃ

—মালিনী ! লক্ষ্মীটি, ছেলেমানুষী ক'র না। ওরা সবাই অপেক্ষা করছে যে। দোর খোল !

স্বামীর এইটুকু আদর বর্ষণেই ওর চাতক-মন তৃপ্ত হয়ে কানায় কানায় ভরে গেল।

কপাট খুলে বাইরে এসে স্বামীর পায়ে শ্রদ্ধাবনত প্রণাম রেখে যেন অপার আনন্দে ভাসতে ভাসতে নামতে লাগল ও সিঁড়ি বেয়ে। বারবার হাসিমুখে ফিরে ফিরে চাইতে লাগল স্বামীর পানে।

এই সময় শার্ঙ্গদেব ডুকরে কেঁদে উঠলেন। বললেন ঃ

—বাবুজী আমি কী পাষাণ হয়েছিলাম তখন? আমার সব মনুষ্যত্বই কি ছেড়ে গিয়েছিল আমার মন?

আমি ওকে সান্ত্বনা দিলাম। বললাম ঃ

—আপনি অধীর হবেন না, শান্ত হোন। নিয়তির ওপর ত কারও হাত নেই, ওস্তাদজী।

—শান্ত যে আমি হতে পারছি না বাবুজী! অমন দেবী প্রতিমাকে আমিই তিলে তিলে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছি! এ যে আমার পক্ষে, যে কোন স্বামীর পক্ষে কতখানি নিষ্ঠুরতা!

অনুশোচনায় অস্থির হয়ে শার্ঙ্গদেব উন্মাদের মত নিজেই নিজের চুল ছিঁড়তে লাগলেন। আমি ত্বরিৎ হাত বাড়িয়ে তাঁকে প্রতি-নিবৃত্ত করে বললাম ঃ

—ছিঃ, এ কি করছেন? আপনি শিক্ষিত, বুদ্ধিমান, আপনার কি অত অধীর হলে চলে?

—বাবুজী, এরপরও কি আপনি আমায় শিক্ষিত বলবেন, বলবেন বুদ্ধিমান?

—ভুল মানুষ করে। 'টু আর ইজ হিউম্যান'। আপনি স্থির না হলে আমি যে পড়তে পারছি না ওস্তাদজী!

আমার এ কথা শুনে শার্ঙ্গদেব অনেকটা যেন শান্তসমাহিত হয়ে বসে রইলেন। তাঁর দু'চোখ দিয়ে অঝোরে ঝরতে লাগলো ব্যথাবিগলিত অশ্রু। মৃদু মৃদু কাঁপতে লাগল ঠোঁট দুটি। তাতেই আমি বুঝতে পারলাম তাঁর মন-গহনে কি প্রচণ্ড ব্যথার ঝড় বইছে।

আমি আবার পড়তে সুরু করলাম।

প্রথমেই ওদের প্রোগ্রাম ছিল আডিয়ার ষ্টেটে। দক্ষিণ ভারতের এই ছোট্ট ষ্টেটকে রাজ্য না বলে জমিদারী বলা চলে। তবে রাজা বিশেষ সৌখিন বলে আমোদ-স্ফূর্তি করেই দিন কাটান। রাজ্য ছোট হলেও নৃত্য উৎসবের আয়োজন করেছিলেন বড়ই। ভারতের নানা প্রান্ত থেকেই নর্ত্তক নর্ত্তকীরা এসেছে। দ্বিতীয় দিনেই মেয়েটির প্রোগ্রাম ছিল। তার অদ্ভুত নাচে রাজ্যের গণ্যমান্য ব্যক্তিবৃন্দ থেকে সাধারণ আসনে উপবিষ্ট দর্শকরা পর্য্যন্ত মোহিত হয়ে গেলেন। রাজা স্বয়ং খুসী হয়ে ঘোষণা করলেন যে, রাজ্যের অধিশ্বরীর অন্যতম কণ্ঠহার এই নৃত্যশিল্পীর প্রতি শ্রদ্ধাস্বরূপ অর্পণ করা হচ্ছে। চারদিক থেকে প্রবলভাবে অভিনন্দন জানান হল মেয়েটিকে।

রাজা নিজে যেচে ওকে ডিনারে নিমন্ত্রণ করলেন পরদিন। ওর বিশেষ ইচ্ছা না থাকলেও রাজবাড়ী থেকে গাড়ী এলে ফিরিয়ে দিতে পারল না, সঙ্গীদের সবার অনুরোধে।

রাজ বাড়ীতে রাজা স্বয়ং গাড়ীর দরজা খুলে ওকে স্বাগত জানালেন। ও গাড়ী থেকে নেমে রাজাকে অনুগমন করে একটা কক্ষে এলো। রাজা ওকে বসতে অনুরোধ করে একটু বাইরে গেলেন। সোফায় বসে ঘরের চারদিকে চেয়ে দেখল ও দেওয়ালে দেওয়ালে কামনা-বিহ্বল নগ্ন বা অর্দ্ধনগ্ন নারীদেহের বিশ্রী বিজ্ঞাপন। মনে মনে ভাবল ও, শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা করার আছিলায় বিকৃত রুচির উপাসনার চমৎকার ব্যবস্থা। কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই রাজা ফিরে এসে এক সোফায় ওর পাশে বসে পড়তেই ও তীর্যক ভঙ্গিতে তার দিকে চেয়ে কঠিন স্বরে বলল :

—ইউ স্যুড লার্ণ ম্যানার্স ফার্ষ্ট।

রাজাও তীর্যক দৃষ্টিতে চেয়ে বলেন :

—ইজ ইট ? আই থিঙ্ক, ইউ ডু নট নো ছাট, ইন দি পাষ্ট, সিক্সটিন বাঈজী লাইক ইউ সিপড্ ড্রিঙ্কস ইন দেয়ার কলার্ড লিপ্স্, ইন দিস রুম এ্যাণ্ড বাই মাই সাইড টু।

রাজার এ কথা শুনে মেয়েটির মন ধ্বক করে জ্বলে উঠল। দৃপ্ত কণ্ঠে বলল :

—বাট, ইউ হ্যাভ ডান মিষ্টেক বাই প্লেসিং মি ইন দেয়ার রো। প্লিজ নোট ছাট, আই ক্যান এনগেজ দোজ সিক্সটিন বাঈজীজ টু পুট অন মাই স্যুজ, ইউ সী !

বলেই এক লাফে উঠে পড়ে মেয়েটি তরতর করে বাইরে চলে এলো। তারপর এক লহমাও অপেক্ষা না করে প্রাসাদের সামনেই অপেক্ষমান রাজার ঝকঝকে গাড়ীটাতে উঠেই সোফারকে বলল :

—ওয়াপাশ লে চলো।

রাজা তার বিশাল বপু নিয়ে ছুটতে ছুটতে বাইরে আসার আগেই তাঁর 'কার' অদৃশ্য হয়ে গেল।

মেয়েটি আস্তানায় ফিরে উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে তার নৃত্য-শিক্ষককে আক্রমণ করে বসল। বলল :

—আমায় নাচবার জন্যই নিয়ে এসেছেন, অন্য কিছুর জন্য নয়। এটা আপনি মনে রাখলে বাধিত হবো।

শিক্ষক অবাক কণ্ঠে বললেন :

—হঠাৎ তুমি চলে এলে যে !

—আমি ওসব লোককে রীতিমত ঘৃণা করি।

কান্না-ছাপা কণ্ঠে কথা শেষ করেই নিজের ঘরে যেয়ে বিছানায়

আছড়ে পড়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল মেয়েটি। বারবার মনে ভেসে উঠল তার ঠাকুমার মুখ।

প্রায় দু'মাসকাল সে কাশ্মীর হতে কন্যাকুমারিকা পর্য্যন্ত নানা স্থানে নৃত্য প্রদর্শন করে ফিরল। অজস্র প্রশংসা, পদক ও সম্মানপত্র লাভ করল। যতদিন বাইরে ছিল, প্রতিদিনই স্বামীকে পত্র দিয়েছে। উত্তরে সপ্তাহে একখানা করে দু'ছত্রের লেখা চিঠি পেয়েছে মাত্র। তার প্রায় প্রতিটিতেই একই গৎ লেখা থাকত—আমার জন্য চিন্তার কারণ নাই ; সাবধান মত থেকো।

ওরা তখন বোম্বে সহরে। সাতদিন ধরে নাচের প্রোগ্রাম করছে —'এরোজ' হলে। বম্বের ইম্প্রেসারিও ওদের থাকবার ব্যবস্থা করেছিল ম্যারিণ ড্রাইভের 'সি ভিউ' হোটেলে। সেদিন শুক্রবার। সকাল থেকেই দলের সবারই 'এলিফেন্টা কেভ' দেখতে যাবার কথা। কেবল মিসির সিং যাবে না। সে যাবে তার এক দেশোয়ালী ভাইয়ের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খেতে। কিন্তু সকাল থেকেই ভীষণ মাথা ধরল মেয়েটির ; তাই সেও যেতে পারল না দলের সবার সঙ্গে। শুয়ে রইলো ঘরে। মাঝে মাঝে তন্দ্রাচ্ছন্ন হচ্ছিল ও আবার মাঝে মাঝে প্রবল ব্যথায় জেগেও উঠছিল।

হঠাৎ একসময় ওর তন্দ্রা টুটে গেল ভেজান দরজা খোলার শব্দে। চোখ মেলেই দেখল দরজা ঠেলে অতি সন্তর্পণে শীকারী বেড়ালের মত পা টিপে টিপে ঘরে ঢুকছে মিসির সিং। ওর মুখে চোখে দৃষ্টি পড়তেই মেয়েটির মনের মাঝে কি এক বিশ্রী শঙ্কা ধ্বক্ করে জেগে উঠল। দেখল ও মিসিয়ের চোখ দু'টো জবাফুলের মত লাল। ও তড়িৎস্পৃষ্টের মত উঠে বসল বিছানায়। বলল ঃ

—মিসির ভাইয়া, এতনা জলদি আপ কিঁউ ওয়াপস আয়া ?

—হাঁ ভাবীজি, কিছু প্রাইভেট কোথা ছিল আপনার সাথে।

—প্রাইভেট কথা! কি বলছেন আপনি?

—কেন ভাবিজী, আপনার মোতো সুন্দরী যুবতীর সোঙ্গে হামার মত যুবকের·········

—চুপ করুন?

চিৎকার করে ধমক দেয় মেয়েটি। সঙ্গে সঙ্গে ছ'হাতে নিজের কান চেপে ধরে। যাতে মিসিয়ের বিশ্রী কথা কানে না যায়।

—কেন নারাজ হচ্ছেন ভাবিজী, হামি জানে আপনার ব্যথা! শারং ভাইয়া আপনাকে পছন করে না।

—বেরিয়ে যান, এই মুহূর্ত্তে বেরিয়ে যান বলছি। নইলে আমি এখুনই ম্যানেজারকে ডেকে উচিত শিক্ষা দেব আপনাকে।

মেয়েটির দৃপ্ত তিরস্কারে ধীরে ধীরে বেরিয়ে যায় মিসির সিং। দরজায় খিল এঁটে এসে বিছানায় ঝাঁপিয়ে পড়ে কাঁদতে থাকে ও। ঠাকুমার সাবধান বাণী, স্বামীর কোন অজ্ঞাত কারণে উপেক্ষা আর মিসির সিংয়ের বিশ্রী আচরণ--এক সঙ্গে ওর মনে তালগোল পাকাতে থাকে। মনের গহনে অবিরাম চলে কান্নার কানাকানি।

ছ'মাস পর বেনারসে ফিরে এসে আবার তার সুরু হল কাল গোণা। স্বামীগৃহে এসে মেয়েটি কত আশা আকাঙ্ক্ষা মনে পোষণ করে ওদের উভয়ের জন্য যে মিলিত শয্যা রচনা করেছিল—তা প্রতিদিন নিয়মিত ভাবে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করে রাখে ও। আর নিজে ভূমিশয্যায় শয়ন করে। মনে মনে কঠোর প্রতিজ্ঞা করে, যতদিন না স্বামী তার প্রতি সুপ্রসন্ন হবেন ততদিন পর্য্যন্ত এই কঠিন ভূমি শয্যায়ই সে শয়ন করবে। তপঃক্ষিন্না সতীর সাধনা যেন সুরু করে সে।

ক্রমে ক্রমে তার পোষাক পরিধানেও অবহেলা সুরু হয়। কেমন যেন যোগিনী-জীবন যাপনের সঙ্কল্প গ্রহণ করে। অনাড়ম্বর সাজ-পোষাকের সঙ্গে সঙ্গে আহারের প্রতি তার অনাসক্তি বেড়ে চলে। অনসূয়া, প্রিয়ংবদা অনুযোগ করে, অনুযোগ করে দাস-দাসীরা। ওদের সে কি করে বোঝাবে, স্বামীউপেক্ষিতা নারীর গলা দিয়ে ক্ষুধার অন্ন যে নামতে চায় না! অতৃপ্ত মনের কাছে বিশ্ব প্রকৃতির মতই ওর কাছে বিস্বাদ লাগে মুখের গ্রাস।

একদিন অনসূয়া আর প্রিয়ংবদা মেয়েটির কাছে এসে কেঁদে বলল :

—সখী, এবার আমাদের বিদায় দাও! কলকাতায় চলে যাই।

—কেন অনসূয়া, কেন প্রিয়ংবদা, তোমাদের কি কোন অসুবিধা হচ্ছে?

উৎকণ্ঠিতা মেয়েটি জানতে চায়। তার প্রশ্নের উত্তরে বেদনার্ত কণ্ঠে অনসূয়া বলে :

—অসুবিধা আর কি সখী। তুমি আমাদের দু'জনকে ঠিক নিজের বোনের মতই স্নেহ কর, ভালবাস। আমরাও তোমায় সেই চোখেই দেখি। কিন্তু সখী, দিনের পর দিন তোমার এই যোগিনী জীবন আমরা আর দেখতে পারি না। তাই আমরা জামাইবাবুকে বলতে গিয়েছিলাম, কেন তিনি তোমায় উপেক্ষা করছেন, কি অপরাধ তোমার?

অনসূয়ার কথার মাঝেই প্রিয়ংবদা বলে ওঠে :

—তার উত্তরে দুষ্মন্ত কঠিন কণ্ঠে বললেন—আমাদের স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপারে তৃতীয় পক্ষ কেউ আসে, এটা আমি চাই না। বল সখী, আমরা কি তোমার কেউ নই?

এ কথা শুনে দু'হাতে মুখ ঢেকে উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে মেয়েটি। কান্নাছাপা কণ্ঠে বলে ঃ

—ওঃ, মানুষ কী নিষ্ঠুর হতে পারে! আমায় উপেক্ষা করেন করুন। আমার যতদূর শক্তি সহ্য করে যাব বা যাচ্ছি, কিন্তু ঠাট্টার পাত্রী তোদের প্রতিও এই ব্যবহার!

অনসূয়া উদ্বেলিতা মেয়েটিকে বুকে টেনে নিয়ে মাথায় সান্ত্বনার হাত বুলিয়ে দেয়। প্রিয়ংবদা বলে ঃ

—সখী, আমাদের দু'জনের জীবনের সব দুঃখ, সব বঞ্চনা ভুলে গিয়েছিলাম তোমার সুখের মাঝে নিজেদের হারিয়ে ফেলে। কিন্তু সেটুকুও ভগবান কেড়ে নিলেন!

—সত্যি সখী, প্রায়ই ভাবি······

বলতে থাকে অনসূয়া ঃ

—কলকাতায় যে দুষ্মন্তকে আমরা স্বাগত জানিয়েছিলাম, এ কি সেই দুষ্মন্ত? না অন্য কেউ। মানুষ যে কি করে এমন বদলে যেতে পারে, তা একে না দেখলে কোনদিনই বুঝতাম না আমরা।

মেয়েটি নিজেকে অনেকটা সামলে নিয়ে বুক নিঙড়ানো একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে ঃ

—সবই আমার ভাগ্য সখী। আমার কপালের লিখন। নিয়তির ওপর ত কারও হাত নেই। আমার মাথার দিব্যি, তোরা এ নিয়ে আর যেন ওঁকে কিছু বলিস না। আর যদি পারিস, ক্ষমা করিস ওঁকে, ওর অপরাধের জন্য আমি······

—ছিঃ সখী, আমাদের তুমি ভুল বুঝো না। তোমার দুঃখকে যদি সমান ভাগে ভাগ করেই নিতে না পারলাম, তবে আর আমরা সখী হলাম কি করে।

বলল অনসূয়া।

এর কিছুদিন পর হঠাৎ একদিন মেয়েটির বাবা এলেন বেনারসে। সেদিন বাড়ী ছিলেন না ওর স্বামী। ওর বাবা ট্রেনের জামা-কাপড়েই একেবারে মেয়েটির ঘরে এসে রাগে ফেটে পড়ে জিজ্ঞেস করলেন ঃ

—মলি, যা শুনছি, সব সত্যি ?

মেয়েটি কেঁদে কেটে একাকার হ'য়ে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বাবাকে শান্ত করল। প্রিয়ংবদা চিঠিতে সব জানিয়েছিল বলে তাকে কত না তিরস্কার করল। মেয়েটি বলল যে, যে দুঃখ সে জীবনে পেয়েছে, তার সবটুকু ফল সে একাই ভোগ করতে চায়। ভাগ্যে যদি সুখ তার নাই থাকে, ব্যাপারটাকে ঘুলিয়ে তুললে ফল ভাল হবে বলে মনে করে না সে। তা ছাড়া সে বিশ্বাস করে যে তার স্বামীর এমন আচরণের পেছনে নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে। যে কারণটা হয়তো তার ব্যক্তিগত সুখের চেয়েও মহৎ। শিল্পী সে, তার ভাব-কল্পনার রাজ্যে অপর কারও অনধিকার প্রবেশ না করাই ভাল।

মেয়ের এ কথা শুনে বিস্মিত ব্যথাক্রান্ত বাবা তার বাধ্য হয়ে ফিরে গেলেন কলকাতায়।

এমনি একাগ্র প্রতীক্ষায় মেয়েটির বিবাহিত জীবনের দীর্ঘ দুটি বছর কেটে যায়। এই সুদীর্ঘ সময়ের প্রতি পল দণ্ড ওর কেটেছে স্বামীর ব্যর্থ প্রতীক্ষায়। বুকের গোপনতায় জমে ওঠা বেদনা ব্যথার আকার নিয়ে ওকে যন্ত্রণা দেয়। রোগ বেঁধেছে বাসা। মাঝে মাঝেই বুকের ব্যথাটা বাড়ে। সেদিনও সেই ব্যথাটা বেড়েছিল। সারাদিন জলটুকু পর্য্যন্তও মুখে দেয়নি। শরীর মন দুইই দুর্ব্বল।

জানালা দিয়ে সন্ধ্যার প্রকৃতিতে চেয়ে দেখলো থালার মত চাঁদ উঠেছে আকাশে। বিশ্ব প্রকৃতিতে চলেছে যেন নিরন্তর এক রূপের খেলা। মনে পড়ল ওর দু'বছর আগের এমনি এক রাত্রিতেই ত ওরা মিলিত হয়েছিল ওদের বাড়ীর নিভৃত কাননে। কত কথা, কত হাসি ঝরেছিল ওদের মুখ থেকে। হ্যাঁ, স্পষ্ট মনে পড়ছে ওর ঃ

ছেলেটি বলেছিল—আকাশ থেকে আজ এমন নির্মল জ্যোৎস্না-ধারা কেন নেমে আসছে ?

মেয়েটি বলেছিল—আমাদের মাথায় সুধা বর্ষণ করতে।

ছেলেটি বলেছিল—বকুল গাছ কেন ফুল ঝরাচ্ছে ?

মেয়েটি বলেছিল—আমাদের আশীর্ব্বাদ জানাতে।

ছেলেটি বলেছিল—তারারা কেন হাসিমুখে মিটি মিটি চাইছে ?

মেয়েটি বলেছিল—আমাদের মিলনে মুগ্ধ হয়েছে বলে।

ছেলেটি বলেছিল—ঝাউয়ের পাতায় বাতাস লেগে ও কিসের শব্দ হচ্ছে ?

মেয়েটি বলেছিল—এ মধু যামিনীতে আমাদের মিলনের আনন্দ-সঙ্গীত।

ছেলেটি বলেছিল—আমি কে ?

মেয়েটি বলে—পুরুষ।

ছেলেটি বলে—তুমি ?

মেয়েটি বলে—প্রকৃতি।

ছেলেটি বলে—আমাদের মিলন কি আজকের ?

মেয়ে—না, যুগ হতে যুগান্তের।

ছেলেটি আনন্দে আবেশে মেয়েটিকে বুকে টেনে নিয়ে বলে—এত কথা তুমি কার কাছে শিখলে ?

মেয়েটি বলে—যৌবনের কাছে !

কত ভাল লাগে নিকট অতীতের সে সব কথা ভাবতে। ভাবতে ভাবতে ওর বুকের ব্যথা যেন ও ভুলে যায়। একটা মৃদু উত্তেজনার আনাগোনা শুরু হয় ওর মনে। শয্যা ছেড়ে উঠে খিল এঁটে দেয় কপাটে। বাক্স খুলে ফুলশয্যার রাতের সেই সুন্দর লাল বেনারসীটা তুলে নেয় অঙ্গে। যত অলঙ্কার ছিল, একে একে পরে নেয় সারা গায়ে। সব প্রসাধন সামগ্রী মেখে নেয় মুখে। গায়ে মাথায় ছিটিয়ে দেয় গন্ধসার। মেয়েটি পরিপূর্ণ সাজে সজ্জিতা হয়ে আয়নায় ভেসে ওঠা প্রতিবিম্বের দিকে চেয়ে দেখে কটাক্ষ হেনে নিজেকে নিজেই জিজ্ঞেস করে :

—এ রূপ কি অবহেলার, অযত্নের ?

উত্তরে নিজের মনেই অস্ফুটে বলে :

—না !

বাইরের আকাশে বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে তখন ওর স্বামীর সঙ্গীতের অগ্নিময় সুরলহরী। দরজায় টোকা মারে কে যেন। ও বলে :

—কে ?

—আমি, অনসূয়া সখী। জামাইবাবুর কফিটা আজ কি আমিই দিয়ে আসবো ? তুমি ত অসুস্থ।

—না, আমিই যাচ্ছি।

বলে দরজা খোলে মেয়েটি। তাকে এ অপরূপ সাজে সজ্জিতা দেখে অনসূয়ার ঠোঁটে হাসির বিদ্যুৎ খেলে যায়। মেয়েটি প্রশ্ন করে ঃ

—কিরে শত্রু, মানায় নি ?

—শত্রুও অস্বীকার করতে পারবে না। কিন্তু সখী, এই অসুস্থ শরীর নিয়ে অভিসার জমবে কি ?

—জানিস সখী, আজ আমার কত আদরের দিন, এই রাত্রিতেই বাবার পূর্ণ সম্মতি পেয়েছিলাম আমরা। আর…

লজ্জারাঙ্গা হয়ে ওঠে মেয়েটির চোখ-মুখ !

—তোদের বলিনি তখন, সে রাত্রি আমরা অভিসারেই কাটিয়েছিলাম—আমাদের কুঞ্জবনে।

হাত বাড়ায় মেয়েটি কফির কাপটা নিতে। স্পর্শ করে বলে ঃ

—এ যে এখনই জুড়িয়ে গেছে। সাধক-পুরুষের কখন ধ্যান ভাঙ্গে তার ত ঠিক নেই। যা লক্ষ্মীটি, আরও ভাল করে গরম করে আন।

অনসূয়া কফি গরম করে আনে শেষ মাত্রা অবধি। কাপটা তুলে দেয় মেয়েটির হাতে। সে লাবণ্যময় জড়িমাজড়িত পদবিক্ষেপে এগিয়ে যায় দোতলা থেকে নীচে নামবার সিঁড়ির দিকে। অনসূয়া চাপা স্বরে গেয়ে ওঠে ঃ

—শ্রীমতী চলিল হায়
আজি অভিসারে-য়ে !

মন ওর আনন্দে ভরপুর। সুদীর্ঘ দু' বছর পর মেয়েটি যেন সেই অভিসার রাত্রির তাকে ফিরে পায় তার সকল সত্তায়।

একপা দু'পা করে সে এসে দাঁড়াল সুরলক্ষ্মীর ধ্যানে তন্ময় স্বামীর সামনে। তিনি যেন এ লোকে নেই। কী গভীর নিমগ্নতা, কী গভীর তন্ময়তা! এমন তন্ময় হয়ে ডাকলে বুঝি ভগবানেরও দেখা পাওয়া যায়। মেয়েটি কফির পেয়ালাটা নামিয়ে রাখলো বেদীর উপরে। চাইল বাইরের প্রকৃতিতে। জ্যোৎস্না-ঝরা মোহময় প্রকৃতি তাকে হাতছানি দেয়! রজনীগন্ধার গন্ধকে ছাপিয়ে হাসনুহানার গন্ধে বাতাস আজ আমোদিত। পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় ও উন্মুক্ত প্রকৃতির মাঝে। আকাশ থেকে নেমে আসা জ্যোৎস্নার কিরণের সুস্নিগ্ধ আলোকস্পর্শে ধরার রূপ হয়ে উঠেছে স্বর্গের মত রমণীয়। শান্ত স্নিগ্ধ নৈশ সমীরণ ওর সর্ব্বশরীরে ব্যজন করে যায়। হাসনুহানার মিষ্টি ভারি গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে ও এগিয়ে যায় সেদিকে। কিন্তু বিমুগ্ধ মেয়েটি ফুলচয়ন করতে হাত তুলতেই শুনতে পায়ঃ

—ফোঁস! ফোঁস!

মুগ্ধ ফণীর সুবাস আঘ্রাণে ও সঙ্গীত শ্রবণে ব্যাঘাত ঘটায় সে ক্রোধে গর্জে ওঠে। বিস্তার করে তার কুটিল ফণা।

—আ-আ-আ!

মেয়েটির ভয়ার্ত্ত চিৎকারে নৈশ নিস্তব্ধতা বিদীর্ণ হয়। ভয়ে নীল মুখ-চোখ নিয়ে ও ছুটে আসে বেদীর কাছে। বক্ষে তখন ওর বইছে উত্তেজনার ঝড়। সর্ব্ব অঙ্গ থরথর কম্পমান। সঙ্গে সঙ্গে ও

নারীজীবনের একমাত্র আশ্রয় স্বামীর কাছে ছুটে আসে আশ্রয়ের আশায়। ভয়কম্পিত কণ্ঠে বলে ঃ

—ওগো শুনছো, সাপ, আমায় সাপ কামড়াতে আসছে!

কিন্তু সে কথা সুরপ্রাচীরের ওপারে অবস্থিত স্বামীর কানে কি পৌঁছাল? উপেক্ষা? অবজ্ঞা? তিলে তিলে সঞ্চিত প্রতীক্ষার পাষাণ প্রাচীর আজ চৌচির হয়ে বেরিয়ে আসে বুভুক্ষার তীক্ষ্ণ ছোবল। এই চরম সময়ে নারীর পরম আশ্রয়ের এই উপেক্ষা মেয়েটিকে ক্ষিপ্ত করে তোলে। কঠিন প্রতিহিংসায় মুহূর্ত্তেই দপ করে জ্বলে ওঠে ওর সারা মন! হাত বাড়িয়ে শক্ত করে ধরে গরম কফির কাপ। আর সঙ্গে সঙ্গেই পাত্র নিঃশেষ করে ছুঁড়ে দেয় তা স্বামীর ধ্যান-গভীর অর্দ্ধ-নিমীলিত চোখ ও সুরালাপে নিরত মুখের দিকে!

মুহূর্ত্তে ওর স্বামীর আর্ত্ত চিৎকার সঙ্গীতের কণ্ঠ চেপে ধরে। থেমে যায় তানপুরার তান; ছিঁড়ে যায় তার! জেগে ওঠে সারাবাড়ী। সবাই ছুটে এসে দেখে মেয়েটির স্বামী অসহ্য যন্ত্রণায় বেদীর উপরে গড়াগড়ি যাচ্ছে। দ্বিতলের সিঁড়ির মুখে মূর্চ্ছিতপ্রায় পতনোন্মুখ মেয়েটিকে বাহু বাড়িয়ে ধরে ফেলে প্রিয়ংবদা। তারপর নিয়ে যায় তাকে তার ঘরে। শুইয়ে দেয় শয্যায়।

অস্থিরতা কিছুটা কমলে মেয়েটি প্রিয়ংবদাকে অনুনয় করে, নীচে গিয়ে সবকিছু দেখতে। সে একটু একা থাকতে চায়। চলে যায় প্রিয়ংবদা। এই সুযোগে মেয়েটি শয্যা ছেড়ে কাঁপতে কাঁপতে কোনক্রমে ওঠে। এগিয়ে গিয়ে কপাটে খিল লাগিয়ে আসে!

আত্ম অনুশোচনায় সে আছড়ে পড়ে। কপাল ঠোকে মেঝের গায়ে। এ সে কি করল? মানব জীবনের সার্থকতম ইন্দ্রিয় যে চক্ষু,

তা থেকে চিরতরে বঞ্চিত করল তার প্রিয়তমকে? এ লজ্জা, এ কলঙ্ক যে অতল সাগরে নিমজ্জমানেও অপনোদন হবার নয়! যে দুটি চোখ দিয়ে তাকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিল সে, সে চোখ আর থাকবে না তার! অন্তর্দাহে উন্মাদিনী হয়ে উঠল সে। মুহূর্ত্তে স্থির করে ফেলল অবিচল সংকল্প। দৃষ্টিহীন তার হৃদয়-বাঞ্ছিত ব্যক্তিটির সামনে আর সে যেয়ে দাঁড়াবে না তার অন্তরের সর্ব্বগ্রাসী বুভুক্ষা নিয়ে। অনেক হয়েছে। এই সুদীর্ঘ দু'বছর ধরে সে ছুটেছে মরীচিকার পেছনে। তাতে তৃষ্ণাই বেড়েছে শুধু। আর সে তৃষ্ণা এমন উলঙ্গ হয়ে উঠেছে যে বাঞ্ছিতজনের পরম ধন অপহরণ করতেও কুণ্ঠিত হয়নি। সে ঠিক করে ফেলল তার উপেক্ষিত জীবনের দীপশিখা আজ প্রভাতের পূর্ব্বেই নিভিয়ে দেবে। পৃথিবী থেকে ঝরিয়ে দেবে তার জীবন-কুসুম।

এরপর আর লেখার কিছু নেই। জগতের লোকের কাছে কোন কৈফিয়ৎই দিতে পারে না সে—যাতে তার অপরাধ কিছুমাত্র লাঘব হতে পারে। তাই ভাগ্যদেবীর যূপকাষ্ঠে সে নিজেকে বলি দিল। সে ভগবানের কাছে কায়মনে এইটুকুই প্রার্থনা করে, যেন তার মত বঞ্চিত, উপেক্ষিত ও অভিশপ্ত ভাগ্য নিয়ে আর কোন নারীই এই হাসি-কান্না-ভরা মায়াময়ী ধরণীর কোন ঘরে জন্ম না নেয়।......

আমার পড়া শেষ হতেই সংযমের বাঁধ ভেঙ্গে সোচ্ছ্বাসে কেঁদে উঠল শার্ঙ্গদেব। আমি তখন কেমন যেন মোহাবিষ্টের মত বসে! মনে হল বিষাদিতা মালবিকার ছায়াদেহ যেন এখনও এই ঘরে নীরবে অশ্রুমোচন করে চলেছে এবং যুগযুগ ধরে করবেও!

হাহাকার করে আমার সামনে বসে কাঁদছে শার্ঙ্গদেব। কেঁদে চলেছে সে কী গভীর আকুল করুণ কান্না! এ কান্না বোধ হয় কোনদিনই শেষ হবে না তার। কাঁদুক সে। কেঁদে কেঁদেই সে তার জীবনের এক ভীষণ ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করুক।

শেষ